ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬০ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ।। ২৬ শ্রাবণ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১১ আগস্ট, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

হামলা যেখানেই হোক করিডর পশ্চিমবঙ্গই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আমেদাবাদে ১৮টি বিস্ফোরণ, সুরাতে ২৫টি বোমা উদ্ধার এবং শ্রীনগরে এক লস্কর জঙ্গি ধরা পড়ার সঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ মিল রয়েছে। তাহল তিনটি

ধৃত জঙ্গি মহম্মদ মুস্তাক

ক্ষেত্রেই জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে ব্যবহার করেছে। এরাজ্য দিয়েই পৌঁছে গিয়েছে বিস্ফোরণ স্থলে। শুধু এবারের ঘটনা নয়, দেশের যে কোনও প্রান্তে গত চারবছরে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, নাশকতা হয়েছে, তার সঙ্গে ঠিক জড়িয়ে পড়েছে

(এরপর ২ পাতায়)

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আমেরিকার আন্তর্জাতিক প্রতারণা

গুরুপুরুষ ।। শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় সার্ক সম্মেলনে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগে সর্বসম্মতভাবে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। পাক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানিও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন যে তাঁর দেশের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আইয়ের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ পাক সরকারের নেই। আই এস আইকে নিয়ন্ত্রণ করে পাক সেনাবাহিনী। এই স্বীকারোক্তির জবাবে মার্কিন বিদেশ দফতরের সহকারী সচিব রিচার্ড বাউচার গিলানিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আই এস আই-কে ফৌজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে আনতেই হবে। কারণ, পাক ফৌজের অধিকাংশই জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তা ছাড়া পাকিস্তানে নির্বাচিত সরকারের অনুশাসনকে আমল না দিয়ে ফৌজি অফিসাররা যেভাবে সমান্তরলাল প্রশাসন চালাচ্ছে তাতে আফগানিস্তান এবং ভারতের শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট হচ্ছে।

সার্ক সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে পাকিস্তান কোণঠাসা হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটবে না। কারণ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আদতে একজন পুতুল প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানে নির্বাচন, সরকার গঠন, প্রশাসন সবই চলে ফৌজের নির্দেশে। আর এই পাক ফৌজের মস্তিষ্ক হচ্ছে আই এস আই। পাকিস্তানে আই এস আই শেষ কথা বলে। আর ঠিক এই কারণেই আই এস আইয়ের

ফকরুদ্দিন আহমেদ

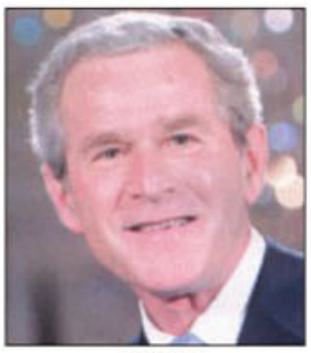

জর্জ বুশ

ইউসুফ রাজা গিলানি

গুপ্তঘাতকরা বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করলেও তার তদন্ত হয়নি। এই ব্যাপারে তদন্ত চেয়ে আন্দোলনে নামতে বেনজিরের দল পাকিস্তান পিপলস্ পার্টিও সাহস করেনি। হ্যাঁ, এতটাই প্রতাপ আই এস আই-এর গুপ্তঘাতকদের। তাই পাকিস্তানের পুতুল প্রধানমন্ত্রীকে কোণঠাসা করে কোনও লাভ বাস্তবে হবে না। সার্কভুক্ত দেশগুলিও কিছু করতে পারবে না। বাস্তবে আই এস আইয়ের বিষ দাঁত ভেঙে দিতে পারে মার্কিন প্রশাসন এবং পেন্টাগন। কারণ, মার্কিন মদতেই একদা এই পাক গুপ্তচর সংস্থার জন্ম হয়েছিল। আজও তার জীয়ন কাঠি মরণকাঠি মার্কিন প্রশাসনের হাতে আছে। মার্কিন প্রশাসন হাত গুটিয়ে নিলে পাক অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা সবই তাসের ঘরের মতো ধসে পড়বে। শীতের ঝরাপাতার মতো আই এস আই উড়ে যাবে।

প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। 'ওয়ার এগেনস্ট গ্লোবাল টেররিজম'-এর প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিগত অর্ধ-দশকে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ দমনে কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে তার মূল্যায়ণ আজও হয়নি। এশিয়া মহাদেশে বিশেষভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত ও আফগানিস্তান জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। এই

(এরপর ২ পাতায়)

অনুপ্রবেশকারীরাই অসমের ভাগ্যনিয়ন্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই অসমের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্দ্ধারণ করে। গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি বি কে শর্মার এই মন্তব্যে অসম সরকার ব্যাকফুটে — আসামীর কাঠগড়ায়। উল্লেখ্য, এর আগে অসমের প্রাক্তন রাজ্যপাল এস কে সিনহা সহ অনেকেই এই বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন অসম সরকারকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

আদালতে পেশ করা কয়েকজন আবেদনকারীর তথ্য খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে

মাননীয় বিচারপতি জানতে পারেন যে, আবেদনকারীরা সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক। আইন ও প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এদেশে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। এবং ওই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই অসমের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করছে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। তবে এতে যে কাজের কাজ কিছু হবে তার সম্ভাবনা কম। কেননা বিরোধী দল ও ছাত্রদের বিদেশী অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের জন্য আন্দোলন নানাভাবে লাগাতার গত ৩০ বছর চলছে। সরকার কমিটি গড়েছে, চুক্তি

(এরপর ২ পাতায়)

উপত্যকার বঞ্চনার বিরুদ্ধেই জম্মু জ্বলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অমরনাথ বোর্ডকে দেওয়া জমি আবার ফেরত দেওয়ার জন্য জম্মুতে একমাসেরও বেশি সময় ধরে তীব্র গণ আন্দোলন চলছে। জম্মুর সর্বস্তরের লোক এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। এছাড়া চলছে লাগাতার বনধ্, হরতাল। রাজ্য প্রশাসন জম্মু ও সাম্বাতে কারফিউ জারির পর এখন বাধ্য হয়ে উধমপুর, রাজৌরি এবং ভদ্রবাহতেও কার্ফু জারি করেছে। এলাকাগুলিতে সেনা নামানো হয়েছে। এককথায় জম্মু জ্বলছে। পুলিশী নির্যাতনে ইতিমধ্যে তিনজন বিক্ষোভকারীর মৃত্যুও হয়েছে এবং একজন বিক্ষোভকারী আত্মহত্যা করেছেন। বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, কংগ্রেস সভানেত্রী জম্মুর অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে বিজেপি-র সাহায্য চেয়েছেন। তিনি সোনিয়াজীকে বলেছেন, কোনও সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের এরকম চরম বিক্ষোভ এর আগে অন্য কোথাও তিনি কখনও দেখেননি। তিনি সরকারকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বিক্ষোভকারীদের জানাতে বলেছেন।

এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাতিল- আদবানি যোগাযোগটা আদবানি-মনমোহন সাক্ষাৎকারের পরবর্তী প্রক্রিয়া বলেই ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন। তাঁদের অনুমান, প্রধানমন্ত্রীকে আদবানিজী অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে দেওয়া জমি আবার শ্রাইনবোর্ডকে ফিরিয়ে দিতে বলেছেন।

বিক্ষোভকারীরা জম্মু বিমানবন্দর অবরোধ করলে ওখান থেকে পি ডি পি নেত্রী মেহবুবা মুফতি এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাও সেখান থেকে শহরে বের হতেই পারেননি। সর্বস্তরের মানুষের সমর্থনের বড় উদাহরণ হল, সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করেও ব্যবসায়ীরা বনধ্ থেকে পিছিয়ে আসেননি। জম্মু চেম্বার অফ্ কমার্সের সভাপতি রামসহায় অভিযোগ করেছেন যে, রাজ্য সরকারের উপার্জন অর্থাৎ রাজ্যের মোট রেভিনিউ-এর ৭০ শতাংশই আসে জম্মু এলাকা থেকে। কিন্তু সিংহভাগ খরচ করা হয় কাশ্মীর উপত্যকার উন্নয়নে।

পুলিশের পক্ষে জম্মুর বিভোক্ষকে সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। জম্মুর এস এস পি শ্রী এস ডি সিং জামওয়াল বলেছেন, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করছে। অন্য একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বলছেন, তাঁরা যতই সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন পরিস্থিতি ততই ঘোরালো হয়ে উঠছে। এবং এরকম ব্যাপক সংখ্যায় জনগণ বিক্ষোভে নামলে পুলিশ কী করবে? কর্মীদের অনুপস্থিতিতে সরকারি কাজকর্ম লাটে উঠেছে। ব্যাঙ্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং

জম্মুতে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ জলকামান ছুঁড়ছে।

কমপিউটার চালিত ব্যবস্থা কাজ করছে না। দৈনন্দিন ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অমিল হওয়া সত্ত্বেও অমরনাথ মন্দিরের জন্য বরাদ্দকৃত জমির বিষয়ে আন্দোলনকারীরা কোনওরকম সমঝোতায় আসতে রাজী নন। অনেকের বক্তব্য, জমি নিয়ে বিবাদকে উপলক্ষ্য করে গত ষাট বছর ধরে কাশ্মীর উপত্যকার শাসন-পীড়নের বিরুদ্ধে জম্মুবাসীদের ধূমায়িত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আন্দোলন বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন যৌথভাবে চালাচ্ছে। কাশ্মীর ভিত্তিক শাসকদের অন্যায় অবিচার ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে জম্মুর মানুষ এবার গর্জে উঠেছে। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ এক হয়েছে। এই বক্তব্য জম্মু বার এসোসিয়েশনের সভাপতি বি এস সালাথিয়ার।

অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে জমি দেওয়া হয়েছিল মুফতি মহম্মদ রাজ্যের জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন। উদ্দেশ্য ছিল বরাদ্দকৃত জমিতে তীর্থযাত্রীদের জন্য সাময়িক ছাউনি করার। সরকার বরাদ্দ বাতিল করার পর শ্রাইন বোর্ড জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হাইকোর্টে আবেদন জানায়। আন্দোলনের সমর্থক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ একথা জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারও হাইকোর্টে এবং এক ডিভিশন বেঞ্চে আপীল করে অমরনাথ যাত্রা চলাকালীন অস্থায়ী কাঠামো তৈরির জন্য। গত ২৬ মে জম্মু কাশ্মীর সরকার ৮০০ কাঠা জমিতে পূর্ব থেকে তৈরি কাঠামো দিয়ে অমরনাথ যাত্রীদের জন্যে অস্থায়ী আবাস তৈরির এক নির্দেশ জারি করে।

সরকারের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে এবার উপত্যকা জুড়ে উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানরা ব্যাপক হিংসাত্মক আন্দোলনে নেমে পড়ে। বিক্ষোভকারীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদ গত ১ জুলাই আগের জমি বরাদ্দের ওই আদেশ নাকচ করে দেন।

সন্ত্রাসবাদীদের কাছে এভাবে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে এরপরই জম্মুতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। একসময় জম্মুতে কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের যে জনাধার ছিল তা শূন্যে পৌঁছে গেছে বলেই ওয়াকিবহাল মহল মনে করে। আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে দলগুলি ব্যর্থ—অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। পি ডি পি দলের জনভিত্তি উপত্যকাতেই ভালো। ২০০২-এর নির্বাচনে পি ডি পি-র ১৬ জন বিধায়কই উপত্যকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

(এরপর ২ পাতায়)

পক্-প্রণালীতে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির কথা চেপে গেছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার সেতুসমুদ্রম্ ক্যানেল প্রজেক্টের জন্য যে শুধুমাত্র পরিবেশবিদদের মতামতকেই উপেক্ষা করেনি তা নয়, সেই সঙ্গে ভারত-শ্রীলঙ্কার পক্-প্রণালীতে দীর্ঘদিন ধরে সুপ্ত দু'টিআগ্নেয়গিরির অস্তিত্বকেও চেপে গেছে। সম্প্রতি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জি এস আই) প্রাক্তন নির্দেশক কে গোপালকৃষ্ণন স্বয়ং এই গোপন তথ্য পেশ করেছেন। একটি ইংরাজি দৈনিকে তিনি জানিয়েছেন, পক্-প্রণালীতে দীর্ঘদিন ধরে আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে এটি বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে আগ্নেয়গিরির প্রসার ক্রমশ বাড়ছে। যা যে কোনও মুহূর্তে ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস বা সুনামির মতো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। অথচ কেন্দ্র সরকার এই বিষয়টি গোপন করার পাশাপাশি এনিয়ে কোনও চিন্তাভাবনাও করেনি। গোপালকৃষ্ণনের মতে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সরকারের গবেষণা ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সরকার আদতে এসব কিছুই করেনি। যদিও এই বিষয়ে দুটি প্রজেক্ট পেপার জিওলজিক্যাল সার্ভে দপ্তরে জমা পড়েছিল। কিন্তু পরিবেশ দপ্তর ও বন দপ্তরকে জানানোর পরও এই বিষয়টিকে তারা পুরোপুরি এড়িয়ে গেছে। ১৯৪৮ সালে প্রথম আগ্নেয়গিরির বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল যা আজও বিদ্যমান।

কে গোপালকৃষ্ণনের মতে, আগ্নেয়গিরির চারপাশে যে তাপমাত্রা তা অত্যন্ত বেশি। হিমালয় ও আন্দামানের টু থ্রি জোনের মতোই এর চারপাশে সবর্দা হাইটেম্পারাচার লক্ষ্য করা যায়। তিনি এবিষয়ে সতর্ক করে বলেন, আগ্নেয়গিরির ওই স্থান থেকে গরম জল নির্গত হতে থাকলে তা ভূমিকম্পের পাশাপাশি সামুদ্রিক প্রাণী ও মাছেরও ভীষণ ক্ষতি করবে।

ইউপিএ সরকার ক্যানেল প্রজেক্ট বাস্তবায়িত করার জন্য যে সবরকম ন্যায়-নীতির সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে, এইসব তথ্যে তা আরও একবার পরিস্কার। যদিও সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সম্প্রতি প্রজেক্টের জন্য সেতুনা ভেঙে বিকল্প পথের নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রামসেতু ভাঙার যে গভীর চক্রান্ত ছিল তা গোপালকৃষ্ণনের দেওয়া তথ্য ও তা গোপন রাখার মধ্য থেকেই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আস্থা ভোটের বলি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ইউ পি এ সরকারের আস্থা ভোটে জয়ের বলি হল ২৪৬ টি অবলা জীব। আস্থাভোটে ২২ জুলাই মনমোহন সরকারকে টিকিয়ে দেওয়াতে উৎসাহিত হন সমাজবাদী দলের নেতারা। মধ্যপ্রদেশের সমাজবাদী দলের বিধায়ক কিশোর সামিত্রে গত ২৮ জুলাই অসমের সিদ্ধ পীঠ কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে দুদিন ধরে ২৪২টি ছাগল ও চারটি মোষ বলি দেন। কামাখ্যা দেবোত্তর ট্রাস্ট সূত্রে এই খবর পাওয়া গেছে। দুদিনে ১২১ টি করে ছাগল বলি দেওয়া হয়। ট্রাস্ট আরও জানিয়েছে, ওই সকল পশুর অর্থমূল্য কম করেও ২৫ লক্ষ টাকা।

বিধায়ক কিশোর সামিত্রে মধ্যপ্রদেশের লানজি ক্ষেত্রের সমাজবাদী দলের বিধায়ক।

বলির ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে গুয়াহাটির সংস্থা 'পিপুল্ ফর এথিক্যাল ট্রীটমেন্ট অফ্ এনিম্যালস্'। তাঁরা আদালতেও যাবেন বলে জানিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থে পশুবলি দেওয়া যায় না। এটা এনিম্যাল রাইটের বিরোধী। একথা বলেছেন ওই সংস্থার পক্ষে সঙ্গীতা গোস্বামী। এদিকে তাঁরা ওই ব্যাপক ছাগবলির বিরোধিতা করে সমাজবাদী দলের নেতা মুলায়ম সিংকে ফ্যাক্সও পাঠান।

সাধারণ মানুষই এবার বুঝতে পারবে, যারা এত টাকার ছাগল বলি দেয় তারা আস্থা ভোটে জেতার জন্য কত টাকা খরচ করতে পারে!

জম্মু জ্বলছে

(১ পাতার পর)

জম্মু-এলাকা থেকে বেশির ভাগ বিধায়ক কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের । তারাও জমি বিতর্কে পি ডি পি দলকেই অনুসরণ করাতে জম্মুর মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছে।

জম্মুর প্রতি বারবার বৈষম্যমূলক আচরণই এই ক্ষোভের উৎস। সম্প্রতি সাবঅর্ডিনেট সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড-এর কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আরও প্রকট ভাবে ধরা পড়েছে। যেখানে উপত্যকা থেকে ২৫০ জন কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেখানে জম্মু থেকে নিযুক্ত করা হয়েছে মাত্র ৬ জনকে। ঘটনাকে তুলে ধরে পানুন কাশ্মীর-এর চেয়ারম্যান তথা কাশ্মীরী পণ্ডিতদের প্রথম সারির সংগঠক ডাঃ অজয় চারণগো বলেছেন, 'জম্মুর প্রতি এই বৈষম্য হিমশৈলের শিখর মাত্র।' তাঁর বক্তব্য কাশ্মীর উপত্যকার রাজনীতিবিদরা যেখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য মাত্র ৮০০ কাঠা জমি দিতে অস্বীকার করছে, সেখানে উপত্যকায় নিজেদের জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফিরে যেতে পণ্ডিতদের তারা কীভাবে সহ্য করবে?

রাজ্য বিজেপির নতুন সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সম্প্রতি রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য বিজেপির নতুন কার্যকরী সমিতির ১৮ সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন। নতুন সমিতির সদস্যরা হলেন — সহ সভাপতি ঃ কর্ণেল সব্যসাচী বাগচী (অবঃ), দেবব্রত চৌধুরী, ডঃ দিবাকর কুণ্ডু, অমলেশ মিশ্র, ইন্দ্রমোহন রাভা ও শ্রীমতী নীলু ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক — অমল চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সিংহ, মলয় মজুমদার, সমীক ভট্টাচার্য, সম্পাদক — বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ বর্মন, রাহুল চক্রবর্তী, স্বপন দাস, প্রভাকর তেওয়ারি ও কমল বেরিওয়াল এবং কোষাধ্যক্ষ — সুশান্ত পাল। উল্লেখ্য, বিজেপির অন্যতম দুই নেতা সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তথাগত রায় বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য।

অনুপ্রবেশকারীরাই অসমের ভাগ্যনিয়ন্তা

(১ পাতার পর)

করেছে, আইন করেছে এবং তার রদবদলও বার বার হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি কিছুই। উল্টে সরকারের কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা জলে গেছে। অনুপ্রবেশকারী বহিষ্কার তো দূরের কথা, বরং অনুপ্রবেশের ঢল অসমের জেলার পর জেলার জনসংখ্যার চারিত্রিক ভারসাম্য বদলে দিচ্ছে। হিন্দু অধ্যুষিত জেলাকে পরিবর্তিত করেছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায়। বেশ কিছু জেলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি। তথ্যপ্রমাণ সহ গুয়াহাটি হাইকোর্ট জানিয়েছে, ১৯৯৬ সালে অসম বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন এক বাংলাদেশী নাগরিক। তাঁর বাড়ি মধ্য অসমের নওগাঁ জেলার যমুনামুখে। ওই বাংলাদেশীর নাম মহম্মদ কামারুদ্দিন। বিচারপতি জানিয়েছেন, ভোটার তালিকায় নাম থাকার ফলে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা অসমে বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এদিকে অসম সরকার এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছে। ফরেনার্স ট্র্যাইবুনালে জমে থাকা মামলাগুলির নিষ্পত্তির ব্যাপারে গগৈ সরকারের গয়ংগচ্ছ মনোভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালত। আদালতের মতে এই ঢিলেমির সুযোগ নিয়ে বহু বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ভোটার তালিকায় নাম ঢোকাতে পেরেছে। ওই মামলাগুলির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দ্রুত নিষ্পত্তির সায় না মেলায় তারও সমালোচনা করেছেন মাননীয় বিচারপতি।

আমেরিকার আন্তর্জাতিক প্রতারণা

(১ পাতার পর)

মুসলিম জেহাদিদের প্রধান ঘাঁটি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মাটিতে। দক্ষিণ এশিয়ার এই দুটি রাষ্ট্রই এশিয়া সহ সারা বিশ্বেই এখন সন্ত্রাসবাদ রপ্তানী করছে। এই তথ্যটি মার্কিন ও বৃটিশ সরকারের অজানা নয়। তাই সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অরগানাইজেশন (ন্যাটো) ভুক্ত শক্তিধর এই দুই রাষ্ট্রের গোপন প্রশ্রয় ছাড়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদীরা অবাধে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারতো না। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা একধরনের আন্তর্জাতিক প্রতারণা। নিউইয়র্কে বিশ্ব বাণিজ্য-সংস্থার বহুতল ভবন দুটি ইসলামি জেহাদি হামলায় ধ্বংস হওয়ার পর মার্কিন সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। বাস্তবে সেই যুদ্ধ চলেছে আমেরিকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে। বিশ্বকে নয়। কথাটা বলতে হচ্ছে এই জন্য যে পাকিস্তানের মাটিতে মার্কিন সেনাবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি আছে। আফগানিস্তান থেকে তালিবানদের হঠাতে এবং ওসামা-বিন-লাদেনকে খতম করতে এই ঘাঁটি গড়া হয়েছিল। একদা এই তালিবানদের আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলে আমেরিকা ঢালাও অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করেছিল। ওসামা তখন ছিল মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি আই এ-র নয়নের মণি। ওসামার নিজস্ব সংগঠন আল কায়দার আত্মঘাতী জঙ্গিরা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর মার্কিন প্রশাসনের হুঁশ হয় যে বিষধর সাপকে দুধ কলা দিয়ে পালন করলেও লাভ হয় না। সাপ ঠিক সময়েই ছোবল দেবে। তার পালনকর্তাকে রেহাই দেবে না। এরপরেই পাকিস্তানে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তালিবানদের হঠাতে আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু আজও সাফল্য পায়নি। কারণ, তালিবানদের আশ্রয় দিয়েছে পাক সেনাবাহিনী এবং আই এস আই। এদের ছত্রছায়ায় থাকার জন্যই আজও ওসামাকে ধরা সম্ভব হয়নি। আই এস আইয়ের বিষ-দাঁত ভাঙতে না পারলে ওসামাকে কোনওদিনই ধরা যাবে না। সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার জন্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে সার্ক সম্মেলনে তিরস্কার করা হয়েছে বলে উল্লসিত হয়ে কোনও লাভ নেই। দরকার এই দুই রাষ্ট্রকে জঙ্গি মুক্ত করা। এই কাজটি করবে কে? সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার প্রবক্তারা জবাব দেবেন কি?

করিডর পশ্চিমবঙ্গই

(১ পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গের নাম। বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে জঙ্গিরা এরাজ্যে ঢুকছে। বিস্ফোরণসহ বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। কাজ হাসিল করছে। আবার এ রাজ্যের সীমান্ত দিয়েই চলে যাচ্ছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান। অথচ সিপিএম সরকার কানে তুলো আর চোখে আঙুল দিয়ে বসে আছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই বাম সরকারের। তারা বরং মুসলমান ভোট হারানোর ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। কিন্তু যেভাবে দেশের যে কোনপ্রান্তে যে কোনও রকমের নাশকতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নাম জড়াচ্ছে তাতে আর কিছুদিনের মধ্যেই অন্য রাজ্যগুলি আমাদের রাজ্যকে সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা বলে অভিযোগ তুলবে। ঠিক যেভাবে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আজ পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের অন্যতম মদতদাতা বলে চিহ্নিত করে থাকে। সন্ত্রাসের মোকাবিলার জন্য বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলো পাকিস্তানের উপর সমানে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। এমনকী আমেরিকা পাক-ভূখন্ডে বিমান হানাও চালাচ্ছে। অথচ তাতে পাকিস্তান সরকারের কিছুই করার থাকছে না। কারণ সারা বিশ্বে তারা নিন্দিত শুধু নয়, একঘরে হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের পশ্চিমবঙ্গের প্রতিও একই অভিযোগ আনবে অন্য রাজ্য। এ রাজ্যের পুলিশের উপর ভরসা না করে অন্য রাজ্যের পুলিশবাহিনী এসে নিজেরাই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অপারেশনে নামছে। সম্প্রতি বুদ্ধ দেববাবু কলকাতার তিন পুলিশ অফিসারকে আমেদাবাদ ও সুরাট পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা ফিরে এসে সরকারকে জানিয়েছেন, গুজরাত পুলিশের তদন্তের যা অগ্রগতি তাতে মনে হচ্ছে, কলকাতা হয়েই জঙ্গিরা সেখানে গিয়েছে।

কাশ্মীরে ধৃত এক লস্কর জঙ্গি সিকন্দরের গ্রেপ্তারের পর রাজ্য সি আই ডি মুর্শিদাবাদ থেকে দুই আল-হাদিসের জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করছে। এরা বাংলাদেশ থেকে আসা লস্কর জঙ্গিদের সীমান্ত পেরনোতে সাহায্য করত। আশ্রয় দিত। দিল্লীতে ধৃত এক কট্টর জঙ্গি কে জেরা করে সে রাজ্যের পুলিশ শিলিগুড়ি থেকে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, দেশের যে কোনও স্থানের নাশকতার সঙ্গে রাজ্যের মাটি ব্যবহার হচ্ছে। এ রাজ্যের মাটি যেন জঙ্গি ডেরায় পরিণত হয়েছে।

নেত্রদান মহাদান

EYE BANK

23218327, 23592931, 22413853
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

দার্জিলিং-এ আসুন

হোটেল **মোনালিসা**-তে

সুলভে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

১, টং সুং রোড, (ম্যাল-এর কাছেই), দার্জিলিং ঃ ৭৩৪১০১

মানস কুমার চক্রবর্তী

দূরভাষ ঃ ০৩৫৪-২২৫৩৭৩২ /৯৪৩৩৪৩৫৪৯৮

কলকাতার যোগাযোগ ঃ ০৩৩-২৫৭২-০৬৯৭

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নাটের গুরু

বাঙ্গালোর ও আমেদাবাদে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর সুরাটেও ২০টির মতো বোমার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধকারী বিশেষজ্ঞরা একটি বিষয়ে একমত যে ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করিয়া লইলেও নাটের গুরু কিন্তু পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই। যে নামের আড়ালেই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া ই-মেল পাঠানো হউক না কেন, তাহারা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত। কেননা এই আক্রমণের কথা তাহাদের আগেই জানা ছিল। দ্বিতীয়ত, এইবারের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পিছনে যাহারা রহিয়াছে তাহারা কেহই পাকিস্তান হইতে আমদানীকৃতআত্মঘাতী বাহিনী নয়। ব্যাঙ্গালোর আমেদাবাদ এবং সুরাটে আক্রমণের ছকেতেই স্পষ্ট যে সন্ত্রাসবাদীরা স্থানীয় এলাকা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এইসব সন্ত্রাসবাদীরা ভারতেরই মানুষ এবং নিজের দেশের মানুষকে বিশেষত হিন্দুদেরকে হত্যা করিতে তাহাদের হাত কাঁপে নাই।

এরপরেও কিন্তু এদেশের প্রভাবশালী মহল এবং সুশীল সমাজ ভারতীয় মুসলিমদের সামগ্রিকভাবে অভিযুক্ত করে নাই। যদিও সন্ত্রাসবাদীরা দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে উসকাইয়া দিতে অনেকাংশে সফল হইয়াছে। ঘটনা হইল, সন্ত্রাসবাদীরা খোলাখুলিই আল্লার নামে হামলা চালাইয়াছে। পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী দলগুলি স্থানীয় দালালদের (হুজি, সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনি প্রভৃতি) সহায়তায় তথ্য-প্রযুক্তির শহর ব্যাঙ্গালোর ও বস্ত্রনগরী আমেদাবাদকে এইভাবে রক্তাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে জানাইয়াছেন যে দেশের অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির সহিত তথ্য-প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলিতে আক্রমণ হানিয়া সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের অর্থনীতিকেই দুর্বল করিতে চায়। সেইজন্যই ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই, হায়দরাবাদ, জয়পুর, আমেদাবাদ ও সুরাটের মতো বাণিজ্যিক অঞ্চ লগুলিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হইয়াছে। এইসব বিস্ফোরণ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ নয়, ছায়াযুদ্ধ। স্বভাবতই সেই চিন্তাধারা চালিত হইয়াই শ্রীমোদী যে দাওয়াই দিয়াছেন তাহা হইল, যুদ্ধ কালীন সময়ে যেরকম তৎপরতার সহিত শত্রুদের মোকাবিলা করিতে হয়, ঠিক সেইরকমভাবেই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের মোকাবিলা করিতে হইবে। নিঃসন্দেহে ইহা একজন যথার্থ দেশপ্রেমীরই কথা। এইজন্যই দেশপ্রেমী দলগুলি ও শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিরোধে অগ্রসর হইতে হইবে।

কিন্তু কথা হইল, ঘরের ইঁদুর যদি বেড়া কাটে, তাহা হইলে সেই বেড়াকে রক্ষা করা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। কাজেই কেন্দ্র সরকারকে সর্বাগ্রে ঘরের ইঁদুরগুলিকে খাঁচায় বন্ধ করিতে হইবে ও জনবিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। তারপরে প্রতিপক্ষকে — অর্থাৎ যাহারা সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে কার্যত ছায়াযুদ্ধ শুরু করিয়াছে, তাহাদের মোকাবিলা করিতে হইবে। কিন্তু ইহা সর্ববাদীসম্মত যে, ঘরের ইঁদুরগুলিকে দমন করিলে তাহার মাধ্যমেই সন্ত্রাসবাদীদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে, অন্যথায় নয়। সন্ত্রাসবাদীরা এই দেশে তাহাদের হীন ও ঘৃণ্য উদ্দেশ্য তখনই চরিতার্থ করিতে ব্যর্থ হইবে যখন প্রতিটি ভারতীয় মনেপ্রাণে ভারতীয়তাবোধে তথা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে। এই দেশে চরমতম বিপদ হইল, এদেশেরই একশ্রেণীর লোক যাহারা নিজেদেরকে 'ভারতীয়' বলিয়া প্রচার করিলেও কিংবা জাহির করিলেও আসলে তাহারা স্বদেশের দৈন্য-দুর্দশা চায়, ভারতের বিপদ দেখিলে খুশী হয়। শ্রীমোদীর বক্তব্যে যাহা ছিল ইঙ্গিতমাত্র, তাহাই বিজেপির অন্যতম শীর্ষনেতা বিজয় কুমার মালহোত্রা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য — সন্ত্রাসবাদীদের ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের পিছনে পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর হাত রহিয়াছে। ভারত সরকার জানাইয়াছে, কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের উপর বোমা হামলার পিছনেও আই এস আই-র হাত রহিয়াছে। এমনকী শ্রীলঙ্কার সার্ক সম্মেলনে পাক-প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ জিলানি অভিযোগটি প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়া ঘটনাটির তদন্ত করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। বস্তুত বিস্ফোরণের গতিপ্রকৃতি ও ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করিবার পর পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই এই কথা স্বভাবতই বলা যাইতে পারে যে, আই এস আই ওই বিস্ফোরণের মস্তিষ্ক। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও অভিযোগ রহিয়াছে আই এস আই-এর বিরুদ্ধে। সেইসঙ্গে একথাও সত্য যে, জম্মু ও কাশ্মীরের বাহিরেও সারা ভারতেই এমন কিছু রাজনৈতিক দল ও শক্তি রহিয়াছে যাহাদের সঙ্গে আই এস আই-র সরাসরি যোগাযোগ রহিয়াছে, কিংবা পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী দল লস্কর-এ-তৈবা, জইস-এ-মহম্মদ ইত্যাদির যোগসাজশ রহিয়াছে। কেন্দ্র সরকারের কাছে ইহার প্রমাণও থাকিতে পারে।

আই এস আই যেমন নেপাল, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে ঘোলাজলে মাছ ধরিয়াছে, ভারতেও সেই চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। এমনকী তাহাদের কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লইয়া পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক নেতারাও উদ্বিগ্ন। আই এস আই ইসলামের মৌলবাদী ভাব-ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আধুনিক বা নতুন কোনও ভাবনা-চিন্তার স্থান সেখানে নাই। নিজেদের ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থ ছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে তাহারা রাজী নয়। জার্মানীর নাৎসীরা যেমন ইহুদী ও জিপসীদের প্রতি অসহিষ্ণু, তেমনই ইহারাও অন্য ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে কোনও ভাবেই সহ্য করিতে রাজী নয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা হিন্দুদেরকে মানবেতর (কাফের) বলিয়া মনে করে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর ই-মেল-এ হিন্দুদের রক্তকে সর্বপেক্ষা 'সস্তা রক্ত' (দি চিপেস্ট অফ অল ম্যানকাইন্ড) বলা হইয়াছে। এক্ষেত্রে তাই ইসলামি জেহাদীদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীরও মোকাবিলা করিতে হইবে। কিন্তু ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য যেভাবে মুসলিম তোষণ নীতি চালাইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহাতে কি সন্ত্রাসবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?

শিল্পায়ন চাই শ্রমিকায়নের প্রয়োজনে কোটিপতি হওয়ার জন্য নয়

দেবব্রত চৌধুরী

বুদ্ধ দেব বাবুর রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও জেলা সদরে একটি সরকারি বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—"কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ", 'বিনিয়োগের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ', 'নগরায়ণ ও শিল্পায়নে এখন জোয়ার এসেছে, 'সংস্কৃতির কেন্দ্র শিল্প, শিল্পে গ্রামের ছেলে মেয়েরা কাজ পাবে'। যে কোনও নির্বাচন এগিয়ে এলে এ ধরনের বিজ্ঞাপনগুলি বেশী করে চোখে পড়ে। সহজেই বোঝা যায় শহর ও গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভালোভাবে প্রচার করতে চাইছে যে বিলম্বে হলেও আবার নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এবার প্রদেশের আয়ের বৃদ্ধি হবে এবং রাজ্যে নতুন কর্মসংস্থান হবে। বোধ হয় খুব তর্ক করার জায়গা নেই যে উভয় ফলাফলই আমাদের পক্ষে হিতকর। কিন্তু এই দুই সুবিধার মধ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি অবশ্যই বেশী কাম্য। কারণ পুঞ্জীভূত বেকার সমস্যা ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতির প্রভাবে কৃষিতে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি যা হবার পশ্চিমবঙ্গে তা অনেক আগেই হয়ে গেছে। কৃষিতে নতুন কর্মবৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমিত। তাই আজকের দিনে নতুন কর্মসংস্থানের যদি কোনও সম্ভাবনা থাকে তা কেবল শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমেই হবে। আর কোনও কারণ যদি নাও থাকে, শুধুমাত্র এই কারণেই নতুন শিল্প বিনিয়োগ আজকের দিনে বিশেষ ভাবে স্বাগত। কিন্তু যেটা বিশেষ ভাবে দেখার দরকার সেটি হচ্ছে, নতুন শিল্পের স্থাপনে রাজ্যের বেকার সমস্যা কতটা সুরাহা হবে। আর একটি বিষয়ে রাজ্যবাসী জানতে চায় বিনিয়োগের যে গল্প রাজ্য সরকার বলছে — "বিনিয়োগের নয়া রাস্তা পশ্চিমবঙ্গ" তা কতটা সত্যি। দেখা যাক, ১৯৯১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ৪৪৭৪ শিল্প বিনিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। মোট লগ্নীর পরিমাণ ৯৩৪২২.৭৩ কোটি টাকা। আদতে এই পনেরো বছরে রূপায়িত হয়েছে ১২৯৮টি শিল্পপ্রকল্প এবং মোট লগ্নীর পরিমাণ ২৯১৪৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত পনেরো বছরে অনুমোদিত লগ্নী প্রস্তাবের মাত্র ৩১ শতাংশ বাস্তবে রূপ পেয়েছে। আসলে সারা ভারতে ১০টি প্রদেশে বিনিয়োগের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ভারতে শিল্পপ্রধান ১০টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান নবম স্থানে। এবার আর একটি দিক দেখা যাক, বিনিয়োগের ফলে রাজ্যে বেকার সমস্যা কতটা সমাধান হবে। পুঁজিনির্ভরশীল শিল্পে রাজ্যের বেকাররা কি চাকরি আদৌ পাবে? চিত্রটা একবার দেখা যাক। (সারণী ১ দ্রষ্টব্য)

সমীক্ষায় আরও জানা গেছে যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গে উদ্বেগজনক (সারণী ২ দ্রষ্টব্য)।

পশ্চিমবঙ্গে ৪.৪ শতাংশ নতুন সংস্থা এগিয়ে গেছে, ওদের পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্রের মডেলটাই আমরা অনুসরণ করতে চাই। পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্র শুনে খটকা লাগতে পারে। হাঁসজারু মনে হতে পারে। কিন্তু কথাটা ইদানীং শিল্পায়ন বিশেষজ্ঞদের দৌলতে চালু হয়েছে ও সমাজবিজ্ঞানীরাও এ নিয়ে বিস্তর চিন্তায় পড়েছেন। শিল্পায়নের ঠেলায় উচ্ছেদ হওয়া ভাসমান মানুষগুলো যাবে কোথায়, করবে কি — এই সমস্যার এক সহজ সমাধানের খোঁজ পাওয়া গেল চীনে। চীনের রাজধানী বেজিং-এর পাড়ায় পাড়ায় এখন গজিয়ে উঠেছে সেক্স-শপ। এটাই ভাসমান উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোর নতুন কর্মসংস্থান ও জীবিকার দিশা — পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের এটা এক অবিচ্ছিন্ন অংশ। বেকার সমস্যা সম্বন্ধে মার্কসের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজার্ভ আর্মি তত্ত্বটি তো বলে যে পুঁজিবাদী শিল্পায়নই বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার স্বনিযুক্ত মানুষগুলোকে উৎখাত করে। তাহলে কেন যে রাজ্যের বামফ্রন্টের নেতারা টেপ রেকর্ডটি বাজিয়ে চলেছেন এবং শিল্পায়ন হলে কর্মসংস্থান হবে এসব কথা শুনিয়ে গ্রামের মানুষকে উৎখাত করছেন কে জানে! বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব বাবু ও শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন সত্যের ধার ধারছেন না। মার্কসবাদী হয়েও চীনের মডেলে যে

সারণী — ১

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

১৯৮০-৮১ সালে	১ কোটি বিনিয়োগ প্রতি	চাকরী পেতো	২২৮ জন
১৯৯৮-৯৯ সালে	১ কোটি বিনিয়োগ প্রতি	চাকরী পেতো	১৬ জন
১৯৯৯-২০০৪ সালে	১ কোটি বিনিয়োগ প্রতি	চাকরী পেতো	৩ জন
২০০৪-২০০৭ সালে	১ কোটি বিনিয়োগ প্রতি	চাকরী পেতো	১.৫ জন

বাড়লো অথচ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হল মাত্র ০.৮৭ শতাংশ। রাজ্য সরকার বলছে, শিল্প হলে কর্মসংস্থান হবে। বর্তমান রাজ্যে জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া কৃষক, বর্গাদার, কৃষি শ্রমিক, বড় মাপের শ্রমিক, নথিভুক্ত ৭৯ লাখ বেকারের কাজ জোটাবার দায় পুঁজি বিনিয়োগকারীরা কিন্তু নিচ্ছে না। কিছু আঁতেল বামপন্থী শিল্পায়নের জন্য চীনকে মডেল হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছেন। আমরাও অনেকে চীনের শিল্পায়ন নিয়ে উচ্ছ্বসিত হই এবং বলি, ওরা আমাদের থেকে কর্মসংস্থান হয় না তার চিত্র দেওয়া হলো। (সরণী ৩ দ্রষ্টব্য)

শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেছেন, সময় কারোর জন্যই অপেক্ষা করে না। আমরা না চাইলে লগ্নীকারীরা পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করবে না, এটা ভাবা ভুল যে এ রাজ্য ছাড়া তাদের বিনিয়োগের জায়গা নেই, মানুষ আমাদের ক্ষমা করবে না যদি আমরা শিল্পায়নকে উপেক্ষা করি। এ ধরনের কথা শুনলে, কয়েকটি বিষয় উঠে আসে। অনেক দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ এনে অনেকটা জমি যোগাড় করে, পুঁজির মুনাফা নিশ্চিত করে নতুন কারখানা গড়াটাই কি শিল্পায়নের এক এবং একমাত্র উপায়? রুগ্নশিল্প ধুঁকবে, বন্ধ শিল্প কবরস্থানে পরিণত হবে, নয়ত রিয়েল এস্টেট হবে, কাজ হারালে শ্রমিক আত্মহত্যা করবে, তাদের পরিবারে বউ মেয়েরা দেহ ব্যবসায় নামবে, আর রাজ্য সরকার ছুটবে কৃষিজমিতে বিনিয়োগ আসা শিল্পায়নের নয়া রাস্তায়? এদিকে নজর না দেওয়াটা কি সদিচ্ছার অভাব নয়? সি পি এম দলের প্রাক্তন রাজ্যসভার সদস্য সর্বভারতীয় নেতা দীপঙ্কর মুখার্জী বলছেন, রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবনে কেরলের পথে হাঁটতে হবে আমাদের। কেরলের সরকার পরিচালিত ৪২টি রুগ্ন সংস্থার ২০০৫-২০০৬ সালে মোট লোকসান ছিল ৬২ কোটি টাকা। ২০০৬-০৭-এ ছবিটা উলটে গেল। লাভের পরিমাণ হলো ৯২ কোটি টাকা। এই সময়ে আরও ৭১৯ জনের বাড়তি কর্মসংস্থান হয়েছে। কথাটা শুনতে কি খুব অবিশ্বাস্য লাগছে? (সূত্র পিপলস্ ডেমোক্রেসি, ১ জুলাই ২০০৭)। আমরা কি ধরে নিতে পারি পরামর্শটা একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপরও বর্তাবে। নাকি ৩২ বছরের রাজত্বের পর "এক উন্নত বামফ্রন্টের" পুরনো আদর্শের স্থান নিয়েছে এক সর্বগ্রাসী "অধিগ্রহণের তীব্র বাসনা" ও পুঁজিবাদের সেবাদাস হওয়ার লালসা।

সারণী — ২

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার

রাজ্য	গ্রাম	শহর	মোট
পশ্চিমবঙ্গ	১.৭০	০.০০	০.৮৭
গুজরাত	১.২৭	১.৪৮	১.৩৯
মহারাষ্ট্র	৩.২৯	০.৯১	১.৭৯

(সূত্র - Fifth Economic Census 2005)

সারণী — ৩

১৯৯০-৯১		১৯৯৭-৯৮		২০০৫-০৬		
নতুন নথি ভুক্ত সংস্থা	নতুন কর্মসংস্থান	নতুন নথি ভুক্ত সংস্থা	নতুন কর্মসংস্থান	নতুন নথি ভুক্ত সংস্থা	নতুন কর্মসংস্থান	সূত্র
২৮৮৪৬	১৬৩১৩২	১৬৩৫৯	৯৮৬৯৫	১১১৯৪	৭১২২২	Economic Survey 1995-96 2001-02 2006-07

এই সময়

সহায়তার আশ্বাস

ইসলামি জঙ্গিদের আক্রমণে ব্যাঙ্গালোর ও আমেদাবাদে নিহত নিরীহ মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে চিঠি দিলেন ফরাসী রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সারকোজি। তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সাতাশটি ইউরোপীয় দেশ ভারতকে সহায়তা করবে। শুধু তাই নয়, আগামী সেপ্টে ম্বরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই বিষয়টি তারা আরও বেশি সহায়তার জন্য আলোচনাও চালাবেন বলে প্রধানমন্ত্রীকেআশ্বাস দেন।

বৃহৎ স্বার্থ

যে কোন মূল্যে রামসেতু রক্ষায় সামিল হবে বিজেপি। লক্ষ্ণৌতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট করে একথা বলেন বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং। তিনি আরও বলেন, দেশের ঐতিহাসিক স্মারক, গৌরবের বিষয়বস্তু ইত্যাদিগুলির প্রতি বিজেপি শ্রদ্ধাশীল। তাই যে কোনও মূল্যেই এই ধরনের বিষয়গুলির প্রতি বিজেপি সংবেদনশীল। ক্ষুদ্র রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে বিজেপি জাতীয় স্বার্থে লড়বে বলেও এদিন তিনি জানান।

ভোটের জন্য অনুপ্রবেশে মদত

ভোটের রাজনীতির স্বার্থে অসম কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের যাবতীয় সরকারি সুযোগ সুবিধা দিয়ে অসমে রেখেছে। গৌহাটিতেএমনই অভিযোগ করলেন অসম গণ পরিষদের নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা চন্দ্রমোহন তেওয়ারি। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ এবং জিহাদি গোষ্ঠীগুলির তৎপরতা যখন অসম জুড়ে বেড়ে চলেছে তখন গগৈ সরকার নীরব, শুধু তাই নয় কেন্দ্র যেখানে ৮ হাজার চারশো একত্রিশ জনকে অবৈধ নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করে জরুরীকালীন ভিত্তিতে দেশের সীমার বাইরে বের করে দিতে বলেছে। সেখানে তারা গড়িমসি করে মাত্র ৯৫ জনকে বের করে বাকীদের পরোক্ষে এদেশে থেকে যেতে ইন্ধন যুগিয়েছে। এমনকী এই বিষয় নিয়ে কথা বললে তাকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিক লাভ তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী গগৈ এবং তার দল কংগ্রেস।

কাঠগড়ায় মুশারফ

উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু সামগ্রী পাকিস্তানই সরবরাহ করেছে। এমনকী তৎকালীন পাক সেনাপ্রধান পারভেজ মুশারফের জ্ঞাতসারেই সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ২০০০ সালে পিয়ংইয়ংগামী একটি বিমানে এই সামগ্রী পাঠানো হয়েছিল বলে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেছেন পাক পরমাণু বিজ্ঞানী আবদুল কাদের খান। সম্প্রতি পরমাণু তথ্য পাচার নিয়ে পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে চলে আসা বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ খানের এই স্বীকারোক্তি রীতিমতো নতুন মোড় নিল বলে আন্তর্জাতিক মহলের অভিমত।

জৈব ফসল

জৈব খাদ্যের ব্যাপক চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্রাথমিকভাবে জৈব গম ও জৈব সরিসার তেল বাজারজাত করতে চলেছে হরিয়ানা কো-অপারেটিভ সাপ্লাই ও মার্কেটিং ফেডারেশন। সংস্থার অন্যতম কর্ণধার হরমহিন্দর সিং চাটার বক্তব্য অনুসারে, দিন দিন যেভাবে জৈব খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে সেদিকে নজর দিয়ে তারা আরও ব্যাপকহারে জৈব ফসল উৎপাদন ও সরবরাহের উদ্যোগ নেবেন। প্রসঙ্গত হরিয়ানার এই সংস্থাটি কৃষি, কৃষিজমি এবং ভোক্তা — এই তিনের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘদিন গবেষণাও চালিয়ে আসছে।

সবার ওপরে মা

সমাজে এখনও 'মা' সবার ওপরে। বিশ্বায়নে কিংবা থার্ড জেনারেশনের মোবাইল যুগেও মধ্যবয়সী যুবক-যুবতীরা মা'র কাছে কোনওরকম মিথ্যা কথা বলে না। শুনতে অবাক লাগলেও সমীক্ষার রিপোর্ট একথাই বলছে। ভারতের সবকটি রাজ্যের যুবক-যুবতীদের ৬৫ শতাংশ বলেছে তারা মাকে মিথ্যা কথা পারতপক্ষে বলে না। একটি ইংরাজি সাপ্তাহিকে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সমীক্ষার ফলাফল আবারও একবার 'মা' র ভূমিকার শাশ্বত দিকটাই তুলে ধরল বলে তথ্যাভিজ্ঞমহেলর অভিমত।

পরোক্ষ ক্ষতি

ধূমপান মাত্রই ক্ষতিকর। তা ধূমপায়ী বা ধূমপান করে না এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সম্প্রতি এমনই এক তথ্য বেরিয়ে এল কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায়। সমীক্ষা অনুযায়ী, ধূমপান না করেও ৩৫ শতাংশ মানুষ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। পরোক্ষ ধূমপানের ফলে সদ্য তরুণদেরও আক্রান্তের তথ্য এই সমীক্ষায় ধরা পড়েছে বলে চিকিৎসকরা দাবি করেন।

জনদরদী

সাংসদ কোটায় উন্নয়নের কাজে বরাদ্দ টাকার বেশিরভাগটাই খরচ করতে পারেনি সিপিএমের দুই সাংসদ ও এক রাজ্যসভার সদস্য। এই তিন মহান সিপিএম নেতারা হলেন সীতারাম ইয়েচুরি, বৃন্দা কারাত ও মহম্মদ আমিন। রাজ্য সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সাংসদ বৃন্দা কারাত ৪০টি প্রকল্পের জন্য আবেদন করেন। তার মধ্যে ৩৯টি অনুমোদিত হয় কিন্তু অনুমোদিত ৩৯টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ২টি প্রকল্পের কাজ হয়েছে। সীতারাম ইয়েচুরিরও অনুমোদিত ১৪৪টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ১৯টি প্রকল্পের কাজ হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যসভার সদস্য মহম্মদ আমিনের অব্যস্থা আরও খারাপ। তাঁর অনুমোদিত ৩৩ টি প্রকল্পের কোনও কাজই হয়নি। জনগণের উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাক বরাদ্দ হলেও তা কাজে লাগাতে কার্যত ব্যর্থ এই তিন জনদরদী নেতা। রাজনৈতিক মহলও এই তিন নেতার কীর্তিতে হতবাক। অনেকের মতে জনগণের জন্য বরাদ্দ টাকাই যারা ব্যয় করতে পারেন না তাদের মুখে জনগণের কথা মানায় না।

ত্রিপুরায় পরিষদের গায়ত্রী মহাযজ্ঞে পরাবর্তন

সংবাদদাতা ।। গত ১৩ জুলাই কৈলাশহরের নিকটবর্তী মনুভ্যালী চা-বাগানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কৈলাশহর প্রখণ্ডের উদ্যোগে এক গায়ত্রী মহাযজ্ঞে পরাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। বিশ্ব গায়ত্রী পরিবারের স্থানীয় শাখার অধ্যক্ষ পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত সিংহ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ওই যজ্ঞে চাবাগানের সর্বস্তরের কর্মীরা অংশগ্রহণ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিগত কয়েকমাস ধরে খৃস্টান মিশনারীরা চা বাগিচার ১৭ নম্বর লাইনে বসবাসকারী মুণ্ডা ও ওরাং জনজাতি সম্প্রদায়ের কিছু চা-শ্রমিককে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে ও ভয় দেখিয়ে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। গত ১৫ জন ব্যাপটিস্ট ওই এলাকার চার পরিবারের ১৩ জনকে খৃস্টান মতে ধর্মান্তরিত করে। অন্যান্য শ্রমিক পরিবারের লোকেরা এই ধর্মান্তরণকরণের বিরোধিতা করে এবং চা বাগান কর্তৃপক্ষকে এই সম্পর্কে জানান। এই ধর্মান্তরকরণকে কেন্দ্র করে চা-শ্রমিকদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক চা বাগান কর্মীদের আহ্বানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কৈলাশহর শাখা এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিল। যে সব চা-শ্রমিক বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত হয়ে খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের শেষে সভায় চন্দ্রকান্ত সিংহ, অমরেন্দ্র কুমার পাল, দীপক ভট্টাচার্য, মাধব সিংহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৬ জুলাই কলকাতায় নরেশ ভবনে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ৪৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অমরনাথ মুখার্জী। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে সভার সূচনা হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক জীবনময় বসু গত বৎসরের কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। সমিতির তরফে তপন নাগ গত বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণ সভায় পেশ করেন এবং আলোচনার পর তা অনুমোদিত হয়। সভায় আগামী বছরের জন্য সমিতির কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়। নবনির্বাচিত এই সমিতির সদস্যরা হলেন সভাপতি — অমরনাথ মুখার্জী, সহ সভাপতি — তপন নাগ, সাধারণ সম্পাদক —জীবনময় বসু, সহ সাধারণ সম্পাদক — প্রভাত ভূষণ দাস ও তপন গাঙ্গুলী, সদস্য —সুনীলপদ গোস্বামী, কল্যাণ সাহা, বিজয় আঢ্য ও প্রদ্যুৎ মৈত্র। সমবেত বন্দেমাতরম্ গীতের মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

লঘু উদ্যোগে ভারতীর সাধারণ সভা

গত ২৬ জুলাই কলকাতার বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রমের সদর দপ্তরের 'স্বস্তিকা' সভাগৃহে লঘু উদ্যোগ ভারতীর প্রাদেশিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় সারা পশ্চিমবঙ্গেরই — সুদূর নকশালবাড়ি থেকে বীরভূম এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সভার সূচনায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস প্রথমে মঞ্চে র সকলের পরিচয় করিয়ে দেন এবং পরে লঘু উদ্যোগ ভারতীর গত দুই বছরের কাজের বিবরণ সভায় পেশ করেন। তিনি বলেন, বাংলার ক্ষুদ্র ও কুটীর উদ্যোগ সারা ভারতের পথ প্রদর্শক, আজও বাংলায় ঐতিহ্যশালী যে শিল্প চলছে তাকে রক্ষা এবং প্রসারেই হবে কর্মসংস্থান। ভারতের অর্থনীতির হৃদপিন্ড এই ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প। একে বাঁচানোর চেষ্টা লঘু উদ্যোগ ভারতী প্রতিনিয়ত করে চলছে বলে তিনি জানান। এরপর বার্ষিক আয়-ব্যয় পেশ করেন এবং সভায় পর্যালোচনার পর তা অনুমোদিত হয়। স্বদেশী শিল্পের সুদূর প্রসারী সফলতার বাস্তব পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন পান্নালাল পাল।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সভায় প্রদেশ কার্যকারিণী গঠিত হয় — জয়দেব নাগ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মুখ্য উপদেষ্টা, শ্যামসুন্দর পোদ্দার — উপদেষ্টা, পান্নালাল পাল — সভাপতি, অজিত নন্দী — কার্যকরী সভাপতি, দীপঙ্কর সরকার — সহ সভাপতি, গোপাল বিশ্বাস — সাধারণ সম্পাদক, ওমপ্রকাশ মাইতি — সম্পাদক, শৈবাল সৎপতি — সম্পাদক, নিত্যানন্দ দাস — সম্পাদক, শিবু মালাকার — সংগঠন সম্পাদক, অপূর্ব মুখার্জ্জি —কোষাধ্যক্ষ, রাজকুমার ফুলওয়ালি — সদস্য, প্রবীর পাখিরা — সদস্য, ভাস্কর মুখার্জি — সদস্য, শ্যামল পাল — সদস্য। কার্যকরী সভাপতি অজিত নন্দী সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

সংস্কার ভারতী-বেহালা শাখার গুরুপূর্ণিমা উৎসব

গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে গত ১৮ জুলাই সংস্কার ভারতী-র বেহালা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল নটরাজ পূজন ও গুরুপূর্ণিমা উৎসব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত শ্রীভট্টাচার্য প্রখ্যাত শিল্পী যদুভট্টের চতুর্থ প্রজন্মের বংশধর। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি এক আদর্শ শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, সঙ্গীত সমালোচক, রবীন্দ্র গবেষক হিসাবে সুপরিচিত। সঙ্গীত শিল্পী হিসাবেও তিনি যশস্বী। এদিন অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক সম্পাদিকা শ্রীমতি নীলঞ্জনা রায়। স্থানীয় শাখার শিল্পীরা সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। সমবেতভাবে বন্দেমাতরম্ গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমারপালের ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

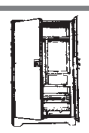
সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচারের জন্য যোগাযোগ করুন
Dass Steel Co.
Mirchak Road. - Malda
Ph. No. 266063

Ganesh Raut (B.Com)
Govt. Authorised Agent
L.I.C.I.
Contact For Better Service
2521-0281, 94323-05737

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী
চিন্তাবিদ "শিবপ্রসাদ রায়ের" অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
প্রকাশকঃ তপন কুমার ঘোষ
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।
প্রাপ্তিস্থান তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোন ঃ ২৩৬০-৪৩০৬, মো ঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
সব বুক স্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

রাজ্য রাজনীতি

ভস্মলোচন বুদ্ধ-নিরুপম গোটা রাজ্যকে ভস্মে পরিণত করলেন

নিশাকর সোম

বুদ্ধ দেব-নিরুপম-এর নেতৃত্বে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত এবং ঝড়তোলা নীতির ফলে এরাজ্যের শিল্পায়নের প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ হয়ে গেলো। কারণ, বুদ্ধ দেব-নিরুপমের ভস্মলোচন দৃষ্টিভঙ্গী। শিল্পায়নের প্রথম প্রয়োজন হল বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ-এর অবস্থা এরাজ্যে বেহাল। বিদ্যুৎমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই হাল পুজো পর্যন্ত চলবে। আমি জোর দিয়ে বলছি, শীতকাল পর্যন্ত চলবে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী সদ্য রোগ থেকে সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরিচালিত বিদ্যুৎ দপ্তর এখনও রোগাক্রান্ত। এর কারণ চীন থেকে সরবরাহ করা যন্ত্র বিকল হওয়া।

এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে হোর্ডিং মারফৎ জানানো হয়েছে যে পারমাণবিক চুক্তির ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেশি পরিমাণে হতে পারে। সিপিএম এর উত্তরে বলছে, সেই বিদ্যুতের দাম অতি বেশি হবে। রক্ষাকবচসহ পারমাণবিক চুক্তি হয়ে যাচ্ছে — এখন সিপিএম কি বলবে? প্রকাশ কারাত-এর মত হল — ভবিষ্যতেও আর কংগ্রেসকে সমর্থন করলে লোকে সিপিএম-কে সুবিধাবাদী বলবে। আরও শোনা যাচ্ছে, সীতারাম ইয়েচুরির নেতৃত্বে আর একটি অংশের মত হল, পার্টি কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত করেছে।

ইতিমধ্যে টাটাদের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে এক হলফনামায় বলা হয়েছে যে — জমি গ্রহণ ও তৎপরবর্তী ঘটনার জন্য তারা কোনভাবেই দায়ী নয়। সমস্ত দায়-দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। ইতিপূর্বে ফরওয়ার্ড ব্লক-সিপিআই-আর এস পি একযোগে বলেছিল, নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের জন্য সিপিএম দায়ি। প্রথম থাপ্পড় খেয়েছিল সিপিএম। এখন টাটারাও ডুবিয়ে দিল। ইজ্জৎ গেলো অথচ পেট ভরলো না। আরও আছে। অনাবাসী লগ্নীকারী প্রসূনবাবু বলেছেন যে বিরোধীদের সঙ্গে কথা না বলে একপাও এগোবেন না। আর একটা চড়। তাই তাড়াতাড়ি নিরুপম সেন বলছেন, তৃণমূলের সঙ্গে বস্‌তে চাই। এ তো সেই ব্যাপার — সেই তো মল খসালি তবে কেন লোক হাঁসালি। এদিকে মমতার ঘোষণা — জমি ফেরত দিন, আলোচনায় বসুন। এর উত্তরে নিরুপম বাবুর বক্তব্য, জমি ফেরত দিলে প্রকল্পটি তো বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ নিরুপমবাবু, শুধু এই প্রকল্প নয় — নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর নিয়ে আপনারা যা করেছেন তার ফলে এ রাজ্যে আর কোনও শিল্পপতি আসবেন না। এখানে আলপিনের শিল্পও গড়ে উঠবে না। আপনারা বিদ্যুৎ-এ এগোতে পারছেন না, অথচ মিত্তলদের বিদ্যুৎ প্রকল্পকে অগ্রাহ্য করলেন। তারা সেই প্রকল্প ওড়িশায় করছেন।

তাই বলছি, ভস্মলোচন বুদ্ধ দেব-নিরুপম এ-রাজ্যে শিল্প প্রচেষ্টাকে ভস্ম করে দিয়েছেন। এখন আর ইনিয়ে-বিনিয়ে কি লাভ? এ অবস্থা থেকে উঠে আসতে গেলে প্রাথমিক ধাপ হল —বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয় চতুষ্টয়কে নেতৃত্ব থেকে সরানো।

শিল্পায়ন-এর জন্য বিগত ৩০ বছরের অধিক সময়ে সিপিএম কিছুই করেনি। প্রায় চার দশক পূর্ব থেকেই হুগলী নদীর গর্ভ ভরাট হয়ে গেছে। নাব্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। তখন গর্ব করে বলা হয়েছিল, হলদিয়া বন্দরকে গড়ে তোলা হবে। ১৯৮৬ সাল থেকে হলদি নদীর গর্ভ বুজে যাচ্ছে। ড্রেজিং করা দরকার। অপদার্থ সিপিএম সরকার তা করেনি। তাই এখন পোর্ট ট্রাস্টের টেকনিক্যাল

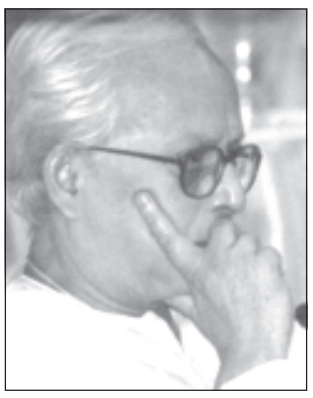

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

অ্যাডভাইসারি কমিটি বলেছে যে হলদি নদীর বা হলদিয়া বন্দরের জলপথ অর্থাৎ প্যাসেজ পরিষ্কার না হলে বন্দর বন্ধ হবেই। প্রাক্তন ডক কর্মী হলদিয়াপতি লক্ষ্মণ শেঠ কি বলেন? তিনি কি রাজা ক্যানুইটের সভাসদদের মতো বলছেন — "হে পলিমাটি, আর ভরিয়ো না নদী-গর্ভ।" অপদার্থ দাঙ্গাবাজদের কাছ থেকে আর কি আশা করবেন? এদের বিদায় আসন্ন। তবে এক না হলে হবে না।

এদিকে সিপিএম-এর সদ্য সমাপ্ত রাজ্য কমিটির সভায় সোমনাথ চ্যাটার্জি এপিসোড নিয়ে যত না কথা হয়েছে তার থেকে বেশি সমালোচনা উঠেছে পঞ্চায়েত এবং পৌর নির্বাচন নিয়ে। সেখানে সমালোচনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয় এবং তাঁদের নীতি এবং ঔদ্ধত্য। রাজ্য কমিটি বাম ঐক্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।

বামফ্রন্টের সভায় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা

নিরুপম সেন

অশোক ঘোষ বলেছেন যে, সিপিএম-এর জেলা নেতাদের আচরণে অ-সিপিএম দলের বামপন্থী কর্মীরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাচ্ছে! হবেই তো। সিপিএম-এর জেলা নেতারা এক একজন জায়গীরদার না হয় মনসবদার! তাই তো পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতা দীপক সরকারকে "ফ্যাসিস্ট" আখ্যা দিয়ে অলক নন্দী পাল্টা কনভেনশন করে পৃথক সমান্তরাল মঞ্চ গড়ে তুলতে চলেছে।

রাজ্যের বাস্তুহারা সংগঠন ইউ সি আর সি-এর সভায় হাওড়ার প্রাক্তন বিধায়ক পদ্মনিধি ধর সভার শুরুতেই ফরওয়ার্ড ব্লককে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর প্রত্যুত্তরে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা যতীন বিশ্বাসও সিপিএম-কে তুলোধূনা করেন।

এ-ছাড়া সমবায় মন্ত্রী তথা ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান রবীন ঘোষ এক বক্তব্যে বলেছেন যে ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন উঠিয়ে নেওয়া, পারমাণবিক চুক্তির বিরোধিতা করা এবং স্পিকার নিয়ে এসব কান্ডকারখানায় ফরওয়ার্ড ব্লকের মত ছিল না — বামপন্থী ঐক্যের খাতিরে মেনে নেওয়া হয়েছিল। আবার এক চড়।

এ-দিকে কলকাতা কর্পোরেশনের ক্লার্কস-ইউনিয়নে সিপিআই-কে সীট দেওয়া নিয়ে কলকাতা সিপিএম দ্বিধা বিভক্ত। শুধু তাই নয়, সমগ্র কলকাতাতে প্রতিটি জোনাল এবং লোকাল কমিটি স্তরে দু'টি সমান্তরাল কমিটি কাজ করছে। ঘুমন্ত জেলা নেতৃত্ব কি আর করবে?

মুর্শিদাবাদে লস্কর-জঙ্গি নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে। আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে এই কলামে মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদের ভেতরে গোপন সভার খবর প্রচারিত হয়। সরকার একেবারেই নড়ে বসেনি। তাই জঙ্গি আক্রমণ ঠেকানোর নামে সারা রাজ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে।

সিপিএম-এর প্রভাতী দৈনিক-এর উদ্যোগে মাওবাদী আক্রমণের চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে। এই প্রদর্শনী তো প্রমাণ করে যে জঙ্গিদমনে ব্যর্থ রাজ্য সরকারের নীতি ও সেই নীতির পরিচালক পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য। তবুও বুদ্ধদেববাবুর হাত থেকে পুলিশ দপ্তর সরানো হচ্ছে না কেন? যেখানে বুদ্ধবাবুকেই সরানোর কথা পার্টির অভ্যন্তরে উঠেছে — সেখানে বিলম্ব কেন? বুদ্ধ বাবুর সামনে থানার ছাদ ভেঙে পড়ে পুলিশের মাথায়, রাজ্যের ছাদ ভেঙে পড়েছে রাজ্যবাসীর মাথায়!

সমগ্র দেশে জঙ্গি হামলার বৃদ্ধির কারণ হল — কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা আর বিগত নির্বাচনে শাসকদলের নীতিহীনভাবে জঙ্গিদের সাহায্য নেওয়া। জানি অস্বীকার করা হবে! তাতে তো সমস্যা চাপা যাবে না।

অন্যরকম

অক্ষর ভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নামটা শুনলে মনে হতে পারে পুণের সাইমনটেক কর্পোরেশন-এর বিজ্ঞানীরা যন্ত্রবিদ্যার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সবাই অক্ষরজ্ঞান শেখানোর কাজে নেমে পড়েছেন। কারণ, তারা দুঃস্থ ও অবহেলিত ছেলেমেয়েদের জন্য যে গ্রন্থাগারটি তৈরি করেছেন তার নাম 'অক্ষর ভারতী'। তবে কোনও প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রবিদরা সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর মানুষদের জীবনে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবার তাগিদে সার্বজনিক পাঠাগার খুলেছেন এটা নিঃসন্দেহে একটা বিরল ঘটনা। তা নাহলে সাধারণ মানুষ ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে বড় বড় যন্ত্রপাতি, ইমারত, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, সেতু, জলাধার ইত্যাদি তৈরি করাটাই আশা করে থাকেন। কিন্তু তার পাশাপাশি মানুষ গড়তে, স্থানীয় বাচ্চাদের লেখাপড়ার অভ্যাস তৈরি করার জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছেন দেখে সবার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবার কথা। বলতে গেলে সেটাই হয়েছে এখানে। আর এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রের এই প্রতিষ্ঠানটিও। যারা ব্যবসায় নেমে সবসময় কেবল লাভের অঙ্কই কষেন, তারা মানে সাইমনটেক-এর পরিচালকরা তাদের কাজের কিছুটা হলেও ক্ষতি করে প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রবিদরা এইভাবে যাকে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র কাজে সময় দিচ্ছেন দেখেও বাধা দেওয়ার বদলে সমর্থন করছো, এমন ঘটনা এই ভূ-ভারতে ক'টা দেখা যায়!

অক্ষর ভারতী-র একটি লাইব্রেরী।

আয়োজন এখনও খুবই ছোট সন্দেহ নেই। অক্ষর ভারতী-কে এককথায় 'সিঙ্গল বুকশেলফ লাইব্রেরি' বলা যেতে পারে। সেখানে এক একটি শেল্‌ফে ৫০০ থেকে ১০০০ বইপত্র রয়েছে।

২০০৭ সালের ১৯ এপ্রিল একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এইসব ইঞ্জিনিয়ারদের আগ্রহে ঘি পড়ে। সেদিন অনুদান হিসাবে মেলে মাত্র ৫ সেট বই। তাতেই সই। তাই দিয়েই শুরু হল প্রথম বুক শেল্‌ফের প্রথম অক্ষর ভারতী লাইব্রেরি। কিন্তু জনপ্রিয়তা এমন তুঙ্গে উঠল যে মাত্র এক বছরের মধ্যে পুণের বিভিন্ন স্থানে অক্ষর ভারতী নয় নয় করেও ৩৫টা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। সব মিলিয়ে বইপত্রের সংখ্যা এখন ৪০ হাজারেরও বেশি। ৩টি স্থাপিত হয়েছে জম্মুতে, ৮টি সাত বোনের এলাকা — ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়েছেন প্রায় ৫০ জন ইঞ্জিনিয়ার। কেউ-ই এজন্য কোনও কপর্দকটিও গ্রহণ করেন না। উল্টে নিজেদের বেতন থেকে যথাসাধ্য দান করেন। আর তারা যা দেন তার সমান টাকা দেয় সাইমনটেক কর্পোরেশন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্ঘশাখায় সময় দেওয়ার মতো সাইমনটেক-এর ইঞ্জিনিয়াররাও সারাদিনে অক্ষর ভারতীর জন্য নিয়ম করে এক ঘন্টা সময় দেন। কার্যালয় পরিচালনা তথা সর্বত্র যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্প্রতি ব্যবস্থিত হয়েছে 'সেবা সহযোগ'-এর।

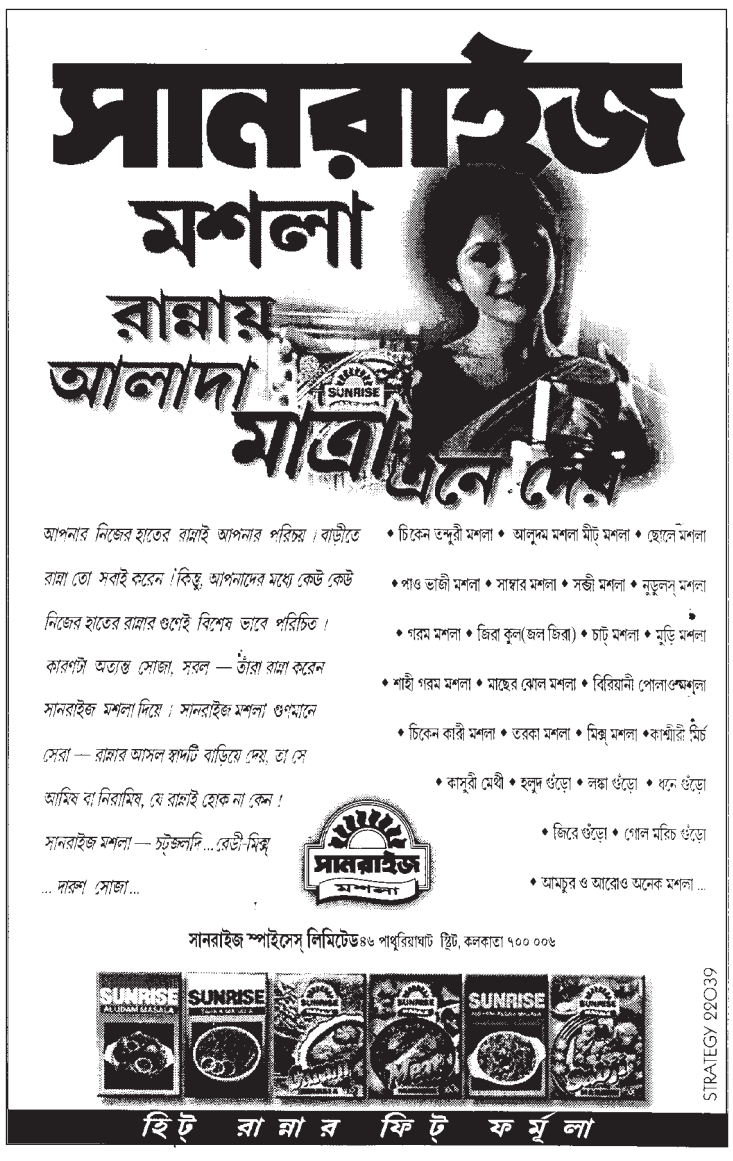

উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে সন্ত্রাসবাদের রমরমা

বাসুদেব পাল

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৬৮ বর্গ কিলোমিটার। বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে জনজাতির সংখ্যা ১৪৫টি। এছাড়া রয়েছেন এমন সব অনেক গোষ্ঠীর মানুষ যাদেরকে জনজাতি তালিকার বাইরে ধরা হয়। এবং সেই সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে এতদঞ্চলে বিবিধ বৈচিত্র্য ও জনগোষ্ঠীর মানুষজন বসবাস করে আসছেন। ইতিহাস-ভূগোলের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বর্তমানের বিভেদমূলক রাজনীতি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সৌন্দর্যকে এলাকার মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বলা যায়।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে 'ইয়ান্দাবো চুক্তি'র মাধ্যমে অবিভক্ত অসম বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। সমতল ও পার্বত্য তাবৎ এলাকাই সেই সময়কার অসমের অন্তর্গত ছিল। চুক্তির পরবর্তী সময়ে আশপাশের সংযুক্ত এলাকার মধ্যে বাঙালী, বিহারী, রাজস্থানী ও নেপালীভাষী ভারতীয়দের অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। রেলপথে যোগাযোগের সুবিধার ফলে বন্যার স্রোতের মতো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিবাসন শুরু হয়ে যায়, পরে তাদের অনেকেই সড়কপথে পার্বত্য এলাকাতেও গিয়ে বসবাস করতে থাকে। এই ব্যাপক অভিবাসনে পরস্পর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া কখনও সম্ভব হয়নি। উপরন্তু, সরকারি অফিসার ও ব্যবসায়ীদের অভিবাসন এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে। ভূমিপুত্র তথা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ ক্রমশ এইসব বহিরাগতদের বিরুদ্ধে উগ্র হতে শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে উগ্র সন্ত্রাসবাদী গতিবিধির সূত্রপাত ঘটে। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল চাষবাস। তাদের মনে কালক্রমে এক আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, ব্যাপকহারে অভিবাসন তাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে দেবে এবং শেষপর্যন্ত অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বৃটিশ শাসন কালেই বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বীজ বোনা হয়েছিল এবং শাসক গোষ্ঠীরই যে তাতে অবদান ছিল একথা বলাই যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে ইংরেজ শাসকরা 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' পলিসি কার্যকর করেছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রেও সেই একই নীতি বহাল রইলো। সেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজটা তারা ভালভাবেই করেছিল। এই ষড়যন্ত্রে চতুর কৌশলী রাজকর্মচারীরাও নিজেদের আখের গোছাতে ইংরেজ শাসকদের সাহায্য করে। গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে। মধ্য ভারতে যা হিন্দু-মুসলমান সংঘাত, সেই একই সংঘাত উত্তর পূর্বাঞ্চলে সমতল এলাকাবাসীদের সঙ্গে পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী জনজাতিদের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান সময়েও উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিভেদমূলক আইন রয়েছে — পার্বত্য জনজাতিরা যে সুবিধা পায় সমতলে বসবাসকারীর জনজাতি গোষ্ঠীভুক্তরা কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অবিভক্ত অসমের শেষ ইংরেজ গভর্ণর স্যার এ্যান্ড্রু ক্লো একবার কোহিমায় যান এবং সেখানে বাফার স্টেট তৈরি ও ভবিষ্যতে পুনরায় পা রাখার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে আসেন। ওই ধুরন্ধর ইংরেজ রাজকর্মচারী অত্যন্ত সন্তর্পণে স্বীয় পরিকল্পনাকে রূপ দেন।

সেই সময়ে জাফু ফিজো নামে একজন নাগা বিদ্রোহী আত্মপ্রকাশ করে গোষ্ঠীভিত্তিক স্বাধীনতার দাবি তোলেন। ক্লো সাহেব তার মধ্যে নিজের ইচ্ছাপূরণের সম্ভাবনা দেখতে পান। নাগা-বসতি যুক্ত এলাকাকে নিয়ে স্বাধীন নাগারাজ্য গঠনের জন্য তাকে ভালোমতো উস্কানি দিয়ে উৎসাহিত করেন। এতকিছু সত্ত্বেও ফিজো কখনও গ্রেপ্তার হননি। অথচ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার দাবি তোলার জন্য অপর এক স্বনামধন্যা নাগা নেত্রী রাণী গাইদিন লিউকে ইংরেজ আমলেই গ্রেপ্তার করে কারান্তরালে চালান করা হয়।

ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ফিজো 'নাগা ন্যাশন্যাল কাউন্সিল, গঠন করেন। তিনি এবং তাঁর গোষ্ঠীই সর্বপ্রথম নাগা বসতিযুক্ত পার্বত্য এলাকার ভারতভুক্তির বিরোধিতা করে। সেটা ছিল ১৯৪৭ সাল। ১৯৫৬-তে নাগা ন্যাশন্যাল কাউন্সিল ভূমিগত (underground) হয়ে যায়। স্বাধীনতার পরেই সম্পূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। গোষ্ঠীগত ও উপাসনা পদ্ধতিগত পার্থক্য স্থানীয় যুবকদের মনে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাকে পরিপুষ্ট করে। তারাই পরবর্তীতে বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর ত্রাণকর্তারূপে হাজির হয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী জনমনকে আরও বেশি করে উস্কে দিয়ে আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার কাজ করে। তখন শান্তি প্রতিষ্ঠা থেকে যুদ্ধ করাটাই সহজ হয়। রাজনৈতিক স্বার্থানুসারী যুবকেরা এক একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী গড়ে তুলে তার পাণ্ডা হয়ে দাঁড়ায়। তারা 'আলাদা রাজ্য', 'স্বায়ত্ত্বশাসন','সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রভৃতি জোর গলায় দাবি করতে থাকে। অন্য কোনও কথা বলার বা ভাবার তাদের যেন সময়ই নেই। তাই বিগত শতকে শেষ ভাগে অবিভক্ত অসম থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটি নতুন রাজ্য আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই গোষ্ঠীগত মনোভাবের ফলে — মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম ও নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের সৃষ্টি।

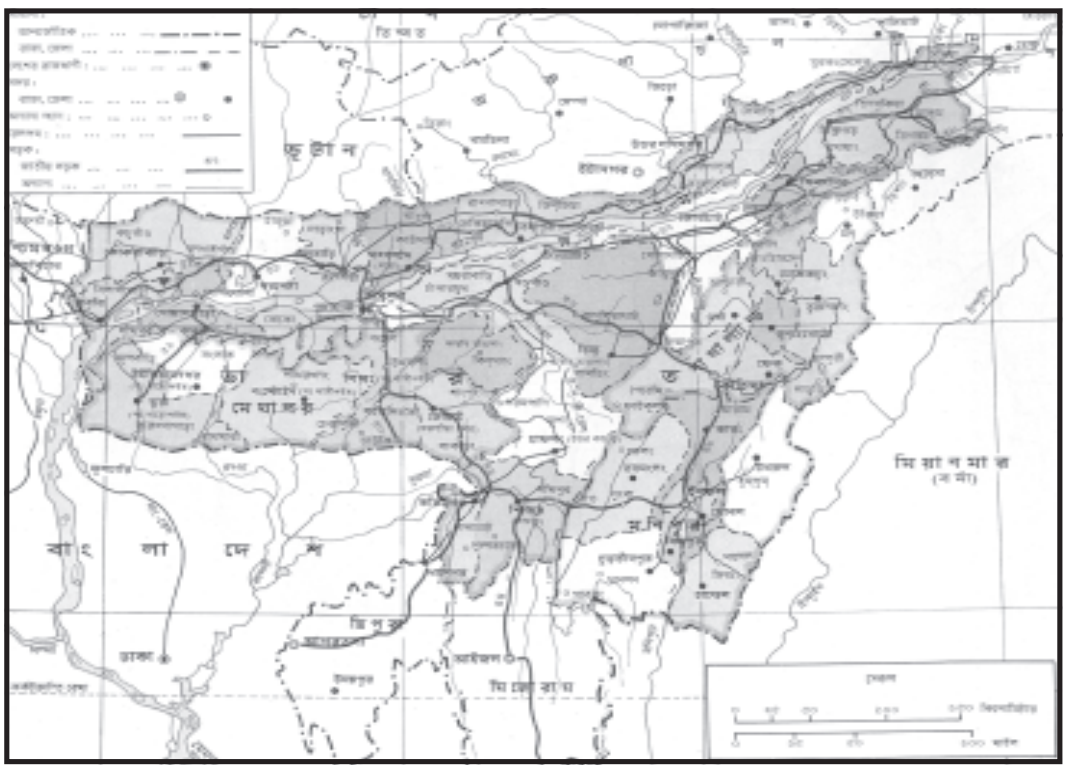

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, অসমের পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে ওই সব আলাদা রাজ্যের সৃষ্টির পরও কিন্তু বিদ্রোহীদের মন তুষ্ট হয়নি। আরও ছোট ছোট জনগোষ্ঠীরাও আলাদা রাজ্যের দাবি করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছোট ছোট জনজাতি গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক সন্ত্রাসবাদী দলের সৃষ্টি হয়েছে। তারাও নতুন নতুন দাবি জানাচ্ছে। তাদের দাবি — বড় গোষ্ঠীগুলো তাদের সীমিত সম্পদকে শোষণ করছে। উল্লেখ করা যায়, মেঘালয় আলাদা রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ১৯৯৫ সালে গঠিত অচিক ন্যাশনাল ভলান্টিয়র কাউন্সিল (ANVC) গারো পার্বত্য জেলায় 'অচিক ল্যাণ্ড' গড়ার দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেছে। আবার একই এলাকায় গারোদের আধিপত্য খর্ব করার জন্য ১৯৯২ সালে গঠিত হয়েছে হাইনট্রাপ ন্যাশন্যাল লিবারেশন কাউন্সিল (HNLC)। ওদিকে মিজোরামে মিজেদের আধিপত্য নিয়ে কোনও সংশয় নেই। ভূমিপুত্র হওয়া সত্ত্বেও রিয়াং ও মার (Hmar) জনজাতিরা নিপীড়িত ও বিতাড়িত। অনেক রিয়াং ও মার জনজাতির লোকেরা খৃস্টান হওয়ার পরও বিতাড়িত হয়েছে। সেজন্য ১৯৯৭ সালে রিয়াংরা গঠন করেছে ব্রু ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা বি এন এল এফ।

মণিপুর ভারতবর্ষের মধ্যে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ রাজ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। সেখানে স্বাধীন ভারতে বিদ্রোহী সন্ত্রাসীদের ইতিহাস বেশ বড়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসবাদী দুটো দল হল পি এল এ (পিপুলস্ লিবারেশন আর্মি) এবং ইউ এন এল এফ বা ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট। ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যেও উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর রমরমা। সবার আগে নাম আসে এন এল এফ টি — ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ ত্রিপুরা, যার আত্মপ্রকাশ ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে। এছাড়া রয়েছে 'অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স' এ টি টি এফ। ১৯৯০ সালে মূলত বাঙালি আধিপত্যকে ত্রিপুরায় খর্ব করতে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসম' (উলফা) আত্মপ্রকাশ করে। সাতরাজ্যে অবিভক্ত অসম বিভক্ত হবার পর ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত অসমে গণ-আন্দোলন তীব্র হয়েছিল বিদেশী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। ১৯৭১-র পর যে সকল বাংলাদেশী অসমে ঢুকেছিল তাদেরকে অসম থেকে বহিষ্কার করা বা বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর লক্ষ্যে ওই তীব্র গণ-আন্দোলন সংঘটিত হয়। সে যাইহোক, 'উলফা' পরবর্তীকালে লক্ষ্যবিহীন হয়ে পড়ে— বিশেষত, যে উদ্দেশ্য নিয়ে উলফার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। বিদেশী বাংলাদেশী বহিষ্কার আন্দোলনের পুরোভাগে এবং সর্বাত্মক নেতৃত্বে ছিল ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ — নাম ছিল, অল অসম ছাত্র ইউনিয়ন বা আসু। তাদের কিছু কর্মী হয়তো উলফাতে যোগ দিয়ে থাকতে পারেন। সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে প্রচুর সংখ্যায় যে সকল উগ্রপন্থী সংগঠন গড়ে উঠেছিল তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও অধিকারের সুরক্ষা। অসমের এরকম একটি শক্তিশালী সংগঠন হলো বোড়ো জনজাতিদের — ন্যাশন্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অফ্ বোড়োল্যান্ড বা এন ডি এফ বি। এই জঙ্গি গোষ্ঠীটির আত্মপ্রকাশ ১৯৮৯ সালে। এর মূলে ছিল সরকার ও উচ্চবর্ণের অসমীয়া সমাজের বড়োদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি উপেক্ষাভাব এবং বড়ো জনজাতিদের জমির মালিকানা খোয়ানো।

২০০৬ সালে অসমে চা-বাগানে কর্মরত বহিরাগত গরীব শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা ও তাদের জনজাতির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার্থে গঠিত হয়েছে, আনলা বা অল অদিবাসী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি। চা-বাগানের ইংরেজ মালিকরা এই জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের চা-বাগানের শ্রমিক হিসেবে উনিশ শতকে উত্তর ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছিল। তাদেরই প্রজন্ম গত ১৫০ বছর ধরে চা-বাগানে কাজ করছে — চরম দারিদ্র্যকে সঙ্গে নিয়েও।

এখন এখানে একটা প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, এই বিরাট সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে টাকা-পয়সা কারা যোগাচ্ছে? তাদের আর্থিক স্রোতের উৎস কি? যদিও এককথায় এর উৎসসমূহ বলা সম্ভব নয়, তবুও বলা যেতে পারে যে, একটি প্রথম ও প্রধান উৎস হল মাদক দ্রব্যের চোরাচালান। যা প্রধানত মায়ানমার বা পূর্বতন ব্রহ্মদেশ থেকেই আসে। তবে কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সংগঠন নানা ছদ্মবেশে সমব্যথী রূপে ওই সকল সংগঠনে ঢুকে পড়েছে। আর ওই সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো তাদের চোরাগলিতে ঢুকে আর বের হতে পারছেনা— হতে পারে বের হতে চাইছেনা। নেতারা বিত্ত-বৈভবে -বিলাসিতায় বিদেশের মাটিতে বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আর ভারতের প্রতিবেশি কয়েকটি দেশও তাদের কূটনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভারতবর্ষের বহু শত বছরের ঐক্য সংহতি বিপন্ন করতে এবং সর্বোপরি ভারতের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, আর্থিক উন্নতি ব্যাহত করতে মদত যুগিয়ে চলেছে। চীন, বাংলাদেশ, মায়ানমার ছাড়াও পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই বাংলাদেশে ও সন্নিহিত ভারতীয় রাজ্যগুলিতে ঘাঁটি গেড়ে সম্পূর্ণ উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মূলত পাকিস্তানকে ভাগ করে বাংলাদেশ গঠনে 'বাঙালি' সত্ত্বার উন্মেষে ভারতের প্রত্যক্ষ সামরিক সাহায্যই কাজ করেছিল। পাকিস্তান সেই প্রতিশোধ সুদে-আসলে তুলতে চায়। দুর্ভাগ্য, কৃতঘ্ন বাংলাদেশ নিজ অস্তিত্ব সম্ভব করে তোলার জন্য ভারতের ভূমিকাকে নস্যাৎ করে পাকিস্তানের হাতের পুতুলে ক্রমশ পরিণত হয়েছে। চীনা আধুনিক সমরাস্ত্র পৌঁছে যাচ্ছে মায়ানমার ও বাংলাদেশ হয়ে তাবৎ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ক্যাডারদের হাতে। তবে এক্ষেত্রে ভারত সরকারের দুর্বল বাংলাদেশ নীতি ও নপুংসক মনোভাবও কম দায়ী নয়। লজ্জা হয় যখন ভারতের বিদেশমন্ত্রী বা বিদেশ দপ্তরের প্রতিনিধিরা থার্ড কান্ট্রিতে অর্থাৎ ব্যাঙ্কক বা আমস্টারর্ডামে গিয়ে উগ্রপন্থী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বিদ্রোহী নেতারা ভারতে এলে তাদেরকে নিজস্ব দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে অবাধে ঘোরাফেরা করতে দেন। সরাকারি আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। ভারত সরকারের সজ্ঞানে ওই নেতারা বিদেশ থেকে এসে সংশ্লিষ্ট প্রদেশে গেলে সেখানে তাদেরকে তোপধ্বনি দ্বারা স্বাগত করে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মান জানানোর ব্যবস্থাও উগ্রপন্থী সংগঠনগুলো করে থাকে।

এছাড়া অস্ত্র দেখিয়ে তোলা তুলেও কম টাকা আমদানি হয় না। তারপর নেতাদের বেনামে নানা ব্যবসায় বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট বিজনেসে টাকা খাটানোর ব্যাপারটাও চলছে। এজন্যই হয়তো এলাকার প্রবীণ সাংসদ পি এ সাংমা একবার বলেছিলেন — উত্তর পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ এক কুটীর শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

অসমে উলফার থেকেও বিপজ্জনক ইসলামি জঙ্গিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বাঙ্গালোর এবং আমেদাবাদের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সতর্কবার্তা বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে গুয়াহাটিতেও পৌঁছেছে। এই সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে অসম সরকার কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে।

সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে পুলিশও বেশ তটস্থ রয়েছে। তাদেরও আশংকা হামলা হতে পারে। কারণ, উত্তর পূর্বাঞ্চলে এবং জম্মু-কাশ্মীরে প্রতিবছরই স্বাধীনতা দিবেসের অনুষ্ঠান বয়কটের ডাক দেওয়া হয় বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে। শ্রীনগরে তো প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানই হতে পারে না। সেনাবাহিনীর কড়া পাহারায় রাজ্যপাল জাতীয় পতাকা তোলেন। কয়েকবছর আগে অসমের ঢেমাজি জেলায় এক স্কুলের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সন্দেহভাজন উলফা জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরীহ নিষ্পাপ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে হত্যা করেছিল।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ ও অসম হল ইসলামি জেহাদিদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। রাজ্য পুলিশের অপরাধ দমন শাখার জেহাদি জঙ্গি গ্রেপ্তারের পরিসংখ্যান দেখলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। অনুপ্রবেশের ফলে অসমের ১২ টির বেশি জেলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা গরিষ্ঠতার

মামুন মিয়াঁ

কাছাকাছি। রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে খোলা জল ও স্থল সীমা। সীমানা নিয়েও বিরোধ মীমাংসা এতবছর পরেও বাকী থেকে গেছে। সেই খোলা পথ দিয়ে অবাধে নির্বিবাদে জঙ্গিরা ঢুকছে, ছোট ছোট এলাকাভিত্তিক স্লিপার সেল গড়ে জেহাদের লক্ষ্যে কাজ চলছে। অসমে ২০০১-এর পর থেকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ২২৭ জন ইসলামি কট্টর জঙ্গি ও আই এস আই এজেন্ট গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশ। এদের মধ্যে ৮৯ জনই ধুবড়ি জেলা থেকে। তবে এটাকে হিমশৈলের চূড়া বলেই বাস্তবে গণ্য করা উচিৎ। এ সময়ে সন্ত্রাসী সংগঠন উলফার একটা বড় অংশ সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে চায়। আর তা বানচাল করতে তৎপর আই এস আই মদতপুষ্ট জেহাদিরা।

এক গোপন সূত্র অনুসারে বৃহত্তর মুসলিম অসম গঠনে সক্রিয় গুপ্ত সংগঠন মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট অফ্ অসম (মূলটা)-এর ১৫০ জন প্রশিক্ষিত জঙ্গি এবং ৫০ জন হরকত উল মুজাহিদিন জঙ্গি অসমে দীর্ঘদিন যাবৎ সক্রিয়। তারা ক্যাডার বা জেহাদি সংগ্রহ করছে মূলত ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা, বনগাঁইগাঁও, দরং, করিমগঞ্জ ও কাছাড় জেলার মুসলমান যুবকদের মধ্য থেকে।

তারপর তাদেরকে সহজেই বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই জঙ্গিরা বেশ কিছু শহর এলাকাতেও সক্রিয়। সেখানেও নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ চলছে। একটি পুলিশ সূত্র জানাচ্ছে — "আমাদের কাছে রাজ্যে ইসলামি উগ্রপন্থীদের সক্রিয়তা সম্পর্কে প্রচুর খবর রয়েছে। কিন্তু কিছু বিশেষ অসুবিধার জন্য তাকে ভাঙ্গতে পারছিনা। এখন উলফার থেকেও ইসলামি উগ্রপন্থী বেশি বিপজ্জনক।"

গুয়াহাটিতে পুলিশের সিনিয়র সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এস রামিসেট্টি বলেছেন, আমেদাবাদ ও বাঙ্গালোরের বিস্ফোরণের পর অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকায় সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। সাদা পোষাকের পুলিশও কড়া নজর রাখছে।

দলিত নেত্রীর রাজ্যে অনাহারে দলিতদেরই মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মূলত দলিতদের ভোটের ওপর ভর করেই যে মায়াবতীর ক্ষমতায় ফিরে আসা, সেই উত্তরপ্রদেশেই দলিতরা এখন উপেক্ষিত। উত্তরপ্রদেশের মোট জনসংখ্যার ১৬.৬ কোটি। (২০০১-র জনগণনা অনুযায়ী) যার মধ্যে ৩.৫১ কোটি দলিত জনগোষ্ঠী। শতাংশের হিসাবে যা ২১.১ শতাংশ। এই ভোটের উপর নির্ভর করেই মায়াবতীর পুনরুত্থান। রাজ্যে মোট ৬৬টি তফসিলি জাতি রয়েছে, যাদের কাছে বি এস পি-এর নেতারা মায়াবতীকে বহিন হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা চালালেও উত্তরপ্রদেশের বাস্তব চিত্রটা অনেকটাই উল্টো। উল্লেখ্য, ২০০৭ এর ১৩ মে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বি এস পি নেত্রী মায়াবতী শপথ গ্রহণ করেন। বিধানসভার ৪১২ টি আসনের মধ্যে মায়াবতীর সংগ্রহ ২০৬ টি আসন। গত ৫ বছরে উত্তরপ্রদেশে দলিতদের অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। বিশেষ করে গত দু'বছরে তা অনেকটাই বেশি। গত বছরে ৪৫ জন জনজাতি শুধুমাত্র অনাহারের কারণেই মারা গেছে। উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলখন্ডের অন্তর্ভুক্ত ঝাঁসি, চিত্রকূট, ললিতপুর, মাহাবো এবং বান্দা জেলার জনজাতিদের অবস্থা আরও খারাপ। এই সব এলাকায় কৃষকদের বেশিরভাগ অংশটা দলিত শ্রেণীভুক্ত কোল ও শাহরিয়া গোষ্ঠীর মানুষ।

বেসরকারি ও সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী অপুষ্টি ও কৃষি ঋণের কারণে উত্তর প্রদেশে দলিতদের অনাহারে ও আত্মহননে মৃত্যু বাড়ছে। অথচ এত কিছুর পরেও মায়াবতী সরকার কোনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেননি। উল্টে মুখ্যমন্ত্রী জোরগলায় বলেছেন, রাজ্যে একটি মানুষও অনাহারে মারা যায়নি বা আত্মহত্যা করেনি। তাঁর এই মন্তব্য হঠকারিতারই নামান্তর বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রাজ্যের বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, মায়াবতী ভোটের পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কোনটাই পূরণ করেননি। শুধু তাই নয়, দলিতদের ভোটে জিতে আসা সরকার দলিতদের জীবনযাত্রারও কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

মধ্যপ্রদেশের জনজাতিদের ক্রেডিট কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মা আমাদের ক্রেডিট কার্ডটা কোথায় রাখব? উনানের আগুনটা উসকে দিয়ে ইন্দিরা দেবী কার্ডটা মেয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তার স্বামীর হাতে দিলেন। নিবারণ হেমব্রম কাঁধের গামছাটা নামিয়ে নিজের ভিজে হাতটা ভালো করে মুছে ক্রেডিট কার্ডটা ঘরের সুরক্ষিতস্থানে রাখতে গেলেন। এই খণ্ড চিত্রটি মধ্যপ্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামের। 'বাবু এ আমাদের গ্রামসমিতির দয়া'— কথা প্রসঙ্গে ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহক নিবারণ হেমব্রম এই কার্ডের সব কৃতিত্বটাই গ্রাম সমিতিকেই দিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের মানডলা জেলার জলতারার জনজাতিদের হাতেও এখন ক্রেডিট কার্ড। মূলত গ্রাম সমিতির অধীনে এই কার্ড বন্টন শুরু হয়েছে।

জনজাতি তথা দরিদ্র পরিবারের জন্যই 'গ্রাম সভা ক্রেডিট কার্ড' নামে এই কার্ড চালু করেছে সমিতি, তবে কোনও এ টি এম কাউন্টার থেকে টাকা তোলার জন্য নয়। পারিবারিক সমস্যায় তারা যাতে স্বল্প সুদে খুব সহজেই টাকা ধার নিতে পারে সেই লক্ষ্যেই এই কার্ড শুরু করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ব্যাঙ্কের টানা পোড়েন বা প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাবে অনেকক্ষেত্রেই গরীব মানুষ টাকা ধার করতে ভয় পায়। আবার ঋণও পায় না। সেক্ষেত্রে 'গ্রাম সভা ক্রেডিট কার্ড' তাদের খুবই কাজে আসবে বলে আশাবাদী গ্রাম সমিতি। মূলত পরিবারের আর্থিক সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে পারিবারিক স্বচ্ছলতার স্বার্থেই এই ব্যবস্থা।

বার্ষিক ৫ শতাংশ সুদের হারে এই ঋণ পাওয়া যাবে। সাড়ে তিন'শর বেশি গ্রামবাসী রয়েছে এমন গ্রামেই এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে।

কিন্তু বিয়ে কিংবা গাড়ি কেনা বা বাড়ির জন্য ঋণ পাওয়া যাবে না। গ্রাম সমিতি এই টাকা পরিবার কল্যাণ দপ্তরের গ্রামীণ খাজাঞ্চি খানা থেকে প্রদান করবে। জনজাতি ও দরিদ্র মানুষের উন্নতিতে সরকারের এই ব্যবস্থায় স্বভাবতই খুশি তারা। এতে সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনেও পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছে রাজ্যের ওয়াকিবহাল মহল।

গুজরাট বিস্ফোরণে স্থানীয়দের যোগসাজশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আমেদাবাদে বিস্ফোরণ এবং সুরাটে বোমা-বিস্ফোরক ছড়িয়ে রাখাতে বহিরাগতদের সঙ্গে স্থানীয়রা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে মনে করছে গুজরাট পুলিশ।

সুরাটের পুলিশ কমিশনার আর এম এস ব্রার জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে গোয়েন্দারা নির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছেন। গুজরাট পুলিশ ৩১ জুলাই পর্যন্ত ৯০ জন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ২৮০ জনকে। সম্প্রতি এক উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে জাতীয় উপদেষ্টা এম কে নারায়ণনও জানিয়েছেন, আগে সরাসরি পাক মদত পুষ্ঠ জঙ্গিরা নাশকতা চালাত। এখন স্থানীয় স্তরে প্রচুর স্লিপার সেল তৈরি হয়েছে। স্থানীয় মানুষের অনেকেই বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত।

শ্রীব্রার বলেছেন, গোয়েন্দারা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা পরবর্তী তদন্তে সাহায্য করবে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আমেদাবাদে বিস্ফোরণ ঘটাতে সন্ত্রাসবাদীরা গ্যাস সিলিণ্ডার ব্যবহার করেছে। এর আগে কোথাও কোনও বিস্ফোরণে গ্যাস সিলিণ্ডারের ব্যবহার দেখা যায়নি। গ্যাস সিলিণ্ডার ও বিস্ফোরক একসঙ্গে ব্যবহার করায় বিস্ফোরণের তীব্রতা বেড়েছে। যার ফলে ক্ষয়-ক্ষতি জীবনহানির মাত্রা বেশি। ব্রুরের দাবি, সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে স্থানীয় দুস্কৃতীরা নিশ্চিতভাবে যুক্ত ছিল। তারাই ঠিক করেছে কোথায় কোথায় বোমা রাখা হবে এবং কীভাবে বিস্ফোরক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। এখন পুলিশ ওই স্থানীয় অপারেটরদের খোঁজে চিরুণী তল্লাশি চালাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ওদের ধরা গেলে অনেক অজানা তথ্য জানা সম্ভব হবে বলে পুলিশের অভিমত।

কর্ণাটকে বিস্ফোরণ রুখতে পরিচয়পত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ১৫ জুলাই তথ্য প্রযুক্তির রাজধানী ব্যাঙ্গালোর শহরে মাত্র ১৫ মিনিটে ৯ টি পর পর বিস্ফোরণের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরপ্পা রাজ্যের বড় শহরের বাসিন্দাদের জন্য পরিচয়পত্র চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেই কারণেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। গত ২৮ জুলাই তিনি এই কথা জানিয়েছেন।

রাজ্য পুলিশ, অনুসন্ধানকারী অফিসার ও বোমা নিষ্ক্রিয় করার অফিসারেরা রাজ্যে যথেষ্ট সতর্ক আছে বলেও তিনি জানান। রাজ্যের মানুষ বিশেষত শহরের বাসিন্দারা জঙ্গি নাশকতা আটকাতে সজাগ থাকবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। কেন্দ্র সরকার দেশ জুড়ে বড় বড় বিস্ফোরণ ঘটার পরও কোনও কঠিন ব্যবস্থা না নিলেও কর্ণাটক সরকারের এই পরিচয় পত্র চালুর সিদ্ধান্তে রাজ্যের নিরাপত্তা আরও বাড়বে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

অন্ধ্রে এবার জেরুজালেম যাত্রীদের জন্যও ভরতুকি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শুধুমাত্র মুসলিম তীর্থযাত্রীদের হজ যাত্রার জন্যই আর্থিক সাহায্য নয়। এবার অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার খৃস্টানদেরও জেরুজালেম যাত্রার জন্য ভরতুকি বা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যেই ওই খাতে দু'কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারি সূত্র অনুসারে খৃস্ট ধর্মালম্বীরা যাতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে যীশুর জন্মস্থান দর্শন করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গেছে। ৫০ থেকে ১০০ জনের একটি দল তৈরি করে তীর্থযাত্রীদের এক সপ্তাহ ধরে সেখানে পাঠানো হবে। সেই সঙ্গে ওই টাকায় আরও পাঁচটি স্থান তাদের ঘোরানো হবে। তীর্থযাত্রীরা যাতে অন লাইনে পাস-পোর্ট পেতে পারে সরকারি ভাবে সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী মহম্মদ আলি শাবিবব বলেছেন, আমরা যে ভাবে মুসলিম তীর্থযাত্রীদের হজ যাত্রার

ব্যবস্থা করে থাকি, এবার সেই ভাবে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদেরও তীর্থ যাত্রার জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। খৃস্টানরা রাজ্য সরকারের এই আর্থিক অনুদানে স্বাভাবিক ভাবেই খুব খুশি। চলতি মাস থেকে তাদের যাত্রা শুরু হবে।

অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার দরিদ্র খৃস্টানদের জন্য গণ-বিবাহের পরিকল্পনাও করেছে। এজন্য সরকার এক একটি বিবাহ বাবদ ১৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করেছে। রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড মুসলিমদের জন্যও এই একই ব্যবস্থার কথা ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। তবে রাজ্য সরকারের খৃস্টান ও মুসলিম প্রীতির পিছনে যে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি কাজ করছে তা বলা বাহুল্য। অনেকের মতে, সরকার এইভাবে অর্থ ব্যয় করে সংখ্যালঘুদের মিথ্যা মন জয় করার চেষ্টা করছে। মানুষ হিসেবে নয়, ভোটার হিসাবেই সরকার তাদের দেখছে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃত

রাকেশ দাশ

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা আমাদের গর্ব ও অভিমান। বিশ্বের প্রাচীনতম এবং সমৃদ্ধ তম এই জ্ঞানভাণ্ডারের আমরা উত্তরসূরী, ধারাবাহক ও সংরক্ষক। কারণ, আমরা ভারতবাসী — ভারতমাতার সন্তান।

আধুনিক যুগে তথাকথিত যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা কিন্তু এই সত্যকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অবহেলা করে অন্তরে বাহিরে নিজেদের পরিপূর্ণরূপে পাশ্চাত্য প্রমাণ করতে বদ্ধ পরিকর। কারণ, আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা অসভ্য ও বর্বর, আমাদের জাতির কোনও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নেই, আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ যুক্তিহীন কুসংস্কার ও আজগুবি কল্পকাহিনীর আকর;এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে না এলে অদ্যাবধি আমরা সভ্যতার প্রকাশ

“প্রশ্ন হল যে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কী আছে যা অন্য ভাষায় অনুপস্থিত ? বলতে গেলে বলতে হয় যে, ভারতবর্ষে ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের গুরুত্ব ছিল ততটা, যতটা আজ গণিতের আছে।”

থেকে বহুদূরে অসভ্য, অর্ধ-উলঙ্গ জাতি হিসেবে পড়ে থাকতাম এবং অজ্ঞানের নরক থেকে আমাদের উদ্ধার হত না।

কিন্তু সত্য সূর্যের ন্যায় স্বয়ম্প্রকাশ। তাকে গুপ্ত রাখা অসম্ভব। তাই এই চরম সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের দিনেও ভারতীয় মনীষীদের অক্লান্ত প্রয়াস ও পরিশ্রমে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গগনচুম্বী গরিমা বিশ্বের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রযুক্তি, বিমানবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্বেদ, প্রাণীবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, ধাতুবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ভারতীয় ঋষিদের বৌদ্ধিক উৎকর্ষের পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। বোধায়ন, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, অগস্ত্য, কণাদ, ভৃগু, নাগার্জুন, চরক, সুশ্রুত, জীবক, চক্রদত্ত প্রভৃতির বৌদ্ধিক উৎকর্ষ ও আবিষ্কারসমূহ আধুনিক বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে বহু অগ্রসর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও এই উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপিণী সংস্কৃত ভাষা আজ অবহেলিত এবং তার সপক্ষে একটি প্রবল যুক্তি হল এই যে, বর্তমান যুগে ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের গুরুত্ব কী এবং কতটা।

আধুনিক যন্ত্রনির্ভরযুগে যান্ত্রিক বা কৃত্রিম ভাষা বিজ্ঞানীদের গবেষণার একটি প্রধানতম বিষয়। এই নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ১৯৮৫সালে NASA-র AI' Magazine একটি সংখ্যায় গবেষক Rick Briggs লেখেন —

“In the past twenty years, much time, effort and money has been expended on desigining on unambigous representation of natural languages to make them accessible to computer processing. These effort have centered around creating rchemata designed to parallel logical relations with relations expressed by the syntax and semantics of natural languages, which are clearly cumbersome and ambigous in their function as vehicles for the transmission of logical data. Understandably, there is a wridespread belief that natural languages are unsuitable for the transmission of many ideas that artificial languages can render with great preccision and mathematical rigor.

But this dichotomy, which has served as a premise underlying much work is the areas of linguistics and artificial istelligence, is false one Sanskrit, which for the duration of almost 1000 years was a living spoken language with a considerable literature of its own. Besides works of literal value, there was a long philosophical and grammatical tradition that has continued to exit with undiminished vigor until the present century. Among the accomphishments of grammarians can be reckoned a methed for paraphrasing Sanskrit is a manner that is identical not only in essence but is from with current work in Artificial Intelligence”.

গত ২০ বছরে প্রচুর সময়, শ্রম ও ধন একটি প্রাকৃতিক ভাষার দ্ব্যর্থহীন, সরল স্বরূপ প্রতিপাদনের জন্য ব্যয় করা হয়েছে, যাতে ভাষাটিকে কম্প্যুটারের প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। প্রাকৃতিক ভাষা (Natural Language)[১] Syntax এবং Semantics [২] দ্বারা শব্দসমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়, অনুরূপ সম্বন্ধসমূহকে তার্কিকভাবে প্রকাশ করার জন্য একটি Sehemata[৩] নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই সকল গবেষণা আবর্তিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একটি বিশ্বাস ছিল যে, কৃত্রিম ভাষা বিভিন্ন ভাবকে যতটা গাণিতিক, তার্কিক ও যথাযথভাবে যন্ত্রের সামনে তুলে ধরতে পারবে, কোনও প্রাকৃতিক ভাষাই তা পারবে না।

কিন্তু এই সমস্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। এরকম অন্তত একটি ভাষা আছে যা উপযুক্ত কাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। ভাষাটি হল সংস্কৃত, যা অন্তত ১০০০ বছর মানুষের মুখের ভাষা ছিল এবং যার নিজস্ব একটি বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার বিদ্যমান। এই উৎকৃষ্ট সাহিত্য ছাড়াও এই ভাষার এক দীর্ঘ ব্যাকরণগত ও দার্শনিক পরম্পরা আছে যা আজও নিজের গুরুত্ব প্রতিপাদনে সক্ষম। এখানকার বৈয়াকরণদের অবদানগুলির মধ্যে

একটি হল, একটি বাক্যের অর্থ বিবরণের এমন একটি প্রক্রিয়ার আবিষ্কার যা বাক্যটির সারার্থ ছাড়াও আধুনিক যন্ত্রোপযোগী বিবরণ প্রস্তুত করতে সক্ষম।

উক্ত গবেষণা এবং আবিষ্কারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, আমাদের কাছে একটি ভাষা আছে যা অন্তত সহস্রাধিক বছর ধরে মানুষের নিত্য ব্যবহারের ভাষা ছিল এবং ভাষাটি ভাবের আদান-প্রদানের একটি উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত মাধ্যম। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হল, NASA — আধুনিক প্রযুক্তির উন্নততম গবেষণাগার, বিশ্বের প্রাচীনতম আধ্যাত্মিক ভাষাকে বিশ্বের একমাত্র দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট ও যথাযথ ভাষা বলে স্বীকৃতি দিল।

বিষয়টির গভীরে যাবার আগে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। বর্তমান কম্প্যুটার নির্ভর প্রযুক্তির অগ্রগতি ও বিকাশ কম্প্যুটার বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। কম্প্যুটারের আবিষ্কারের পর থেকে তার ব্যবহারের জন্য যান্ত্রিক ভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। প্রথম যান্ত্রিক ভাষা ছিল দ্বি-অক্ষরীয় ভাষা যাতে কেবল ০ ও ১ (শূন্য এবং এক) এই দুটি চিহ্ন (শব্দ বা অক্ষর) ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কালে প্রোগ্রামিং ভাষা (Programming Languages) যেমন Basic, Cobol ইত্যাদি এবং তারও পরে উচ্চস্তরীয় প্রোগ্রামিং ভাষা যেমন C,CTT, Java, Visual Basic, Perl Pythan প্রভৃতির উদ্ভব ঘটল।

কিন্তু এই ভাষাগুলির প্রধান অসুবিধা হল এগুলি অত্যন্ত জটিল, সীমিত এবং সাধারণের পক্ষে এগুলি শিখে কম্প্যুটারের ব্যবহার এক প্রকার অসম্ভব।

সেজন্য কম্প্যুটার বিশেষজ্ঞরা একটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রাকৃতিক ভাষার খোঁজ শুরু করলেন যার ব্যবহার যন্ত্রে করা যাবে। এ বিষয়ে তাঁদের সহযোগিতায় এলেন ভাষাতত্ত্ববিদরা। এক নতুন ক্ষেত্রে গবেষণা শুরু হল যার নাম NLP (Natural Language Processing) বা প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ। এই ক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধা যান্ত্রিক অনুবাদ (Machine Translation) প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর বিশেষ জোরের সাথে কাজ শুরু হয়। Chomsky প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদদের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে চলতে লাগল গবেষণা। কিন্তু আধুনিক ভাষা সমূহের Syntax & Semantics-এর জটিলতার জন্য কোনও গবেষণাই ফলপ্রসূ হল না। শেষ পর্যন্ত গবেষণার ফল কী দাঁড়াল তা আমরা Rick Briggs-এর প্রবন্ধে দেখেছি।

প্রশ্ন হল যে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কী আছে যা অন্য ভাষায় অনুপস্থিত ? বলতে গেলে বলতে হয় যে, ভারতবর্ষে ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের গুরুত্ব ছিল ততটা, যতটা আজ গণিতের আছে। এ বিষয়ে রুশ গবেষকদের সিদ্ধান্ত হল —

“The time has came to continue the tradition of the ancient grammarians on the basic of the modern ideas in general linguistics.”

সংস্কৃত শব্দটির অর্থ হল পরিষ্কৃত বা দোষরহিত। তাই এই ভাষায় ব্যাকরণের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বলা ভাল ভাষাটি পূর্ণমাত্রায় ব্যাকরণ নির্ভর। এর ফলে এতে Syntax বা Semantics-এর জটিলতা অনুপস্থিত, যা অন্যান্য ভাষাগুলির বৈজ্ঞানিক ভাষা হওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজী ভাষার Cat, kills, rat-এই তিনটি শব্দের অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা বাক্যের Syntax এবং Semanties-এর উপর নির্ভরশীল। যেমন — Cat kills rat — বাক্যটির শব্দগুলির পরস্পর স্থান বদল করলে ব্যাকরণগত ত্রুটি না থাকলেও বাক্যটি শুদ্ধ হবে না। যথা—

Rat kills cat.

ফলে বাক্যের অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শব্দগুলি স্বাতন্ত্র্যহীন এবং ভ্রামক।

সংস্কৃত ভাষায় বাক্য গঠন ও অর্থ নির্ণয়ে কারক চক্রের প্রাধান্যের পদ বিন্যাসের গুরুত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। যেমন — ‘মার্জারঃ, মূষকং মারয়তি’, ‘মূষকং মারয়তি মার্জারঃ’, ‘মারয়তি মূষকং মার্জারঃ’ — সকল বাক্যই সমানার্থক ও শুদ্ধ। প্রতিটি পদ স্বতন্ত্রভাবে অর্থপ্রকাশে সমর্থ। ফলে অন্যান্য ভাষার তুলনায় ভাষাটি অত্যন্ত নমনীয়। — স্বভাবতই ভাষাটি অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত ও নিখুঁত।

এভাবে স্মরণাতীত কাল পূর্বে ভারতীয় মনীষীগণ একটি শুদ্ধ, উন্নত সমৃদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত ভাষার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন যা ভারতবর্ষে মুসলিম আগ্রাসনের পূর্ব পর্যন্ত সহস্রাধিক কাল ধরে লোকভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করতে গিয়ে বিদেশী শাসকবৃন্দ বহু প্রয়াসে জনসমাজ থেকে সংস্কৃতকে দূরে সরিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও আজ ভারতে তিনটি গ্রামের সহস্রাধিক মানুষের মাতৃভাষা সংস্কৃত। ভারতে দশাধিক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লক্ষাধিক ছাত্র সংস্কৃত পড়ে। সংস্কৃত ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা প্রায় ২০টি। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির শব্দভাণ্ডারের প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ শব্দ সংস্কৃত। এবং সর্বোপরি বিশ্বের বিজ্ঞানীদের গবেষণার একটি প্রধানতম বিষয় সংস্কৃত ভাষা।

উৎসাহী পাঠক সাধারণের সূচনার্থে — বর্তমানে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী; International Institute for Information Technology (IIIT), Hydrabad, Indian; Institute of Technology, Kanpur; India Institute of Technology, Mumbai, Central University, Hydrabad; Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, Jagadguru Ramananda -charya Rajasthan Sanskrit University, Jaipur — প্রভৃতি সংস্থায় উক্ত বিষয়টির গবেষণা ও বিভিন্ন পাঠ্যক্রম চলছে।

সুতরাং, সংস্কৃত ও তার পাঠকরা পশ্চাৎপদ — এই ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত এবং পরিত্যাজ্য।

অন্ততোগত্বা, উপসংহারে বলতে হয় যে, সংস্কৃত শুধু বৈজ্ঞানিক ভাষাই নয়। এটি একটি আধ্যাত্মিক ভাষা। যার শব্দ সকল শ্রবণমাত্রই মানুষের হৃদয়ে উচ্চভাব সকল জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষাটি অদ্যাবধি নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় সফল। গবেষক Vyas Houstan লিখেছেন —

“Sanskrit, the language of Mathematical precision, is the worlds only unambigous spoken language. But the lingustic perfection of Sanskrit offers only a partial explanation for its sustained presence in the world for at least 3000 years.High precision in and of itself is of limited scope. Generally it Excites the brain but not the heart. Sanskrit is indeed a perfect language in the same sense as Mathmatics, but Sanskrit is also perfect language in the sense that, like music, it has the power to uplift the heart.”

সংস্কৃত সপ্তাহের এই পুণ্যলগ্নে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃতের এই গৌরবশালী অতীতকে স্মরণ করে তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের সংকল্প নেওয়া আমাদের দায়িত্ব ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আসুন আমরা সকলে মিলে তা পালন করি।

পাদটীকা ঃ—

১। যন্ত্রের ভাষা, যা অত্যন্ত জটিল ও মানুষের প্রাকৃতিক ব্যবহারের যোগ্য নয়।

(এরপর ১৩ পাতায়)

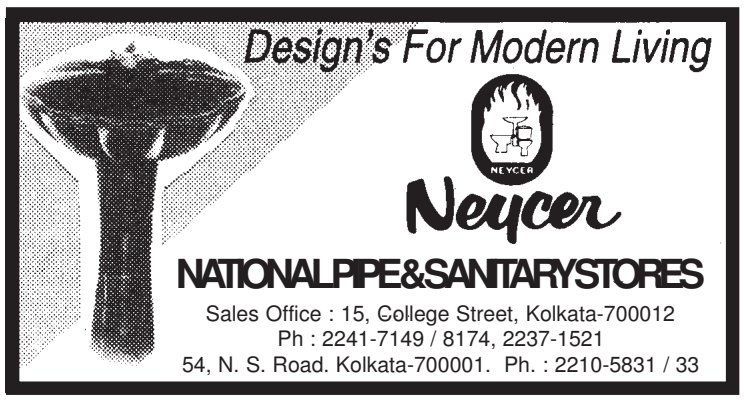

সংস্কৃত সম্ভাষণ

রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিক ভাবনা

নবকুমার ভট্টাচার্য

দশদিনে কি সংস্কৃত শেখা সম্ভব? ব্যাকরণ না পড়েও কি সংস্কৃত শেখা যায়? অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা মানেই যে দাঁত ভাঙা খটোমটো কিছু নয়, 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করা নয়, এ ভাষায় আধুনিক যুগের জটিল সব বিষয় প্রকাশ করা সম্ভব, ব্যাকরণ না জেনেও ব্যবহারিক কথাবার্তায় এ ভাষা কোনও বাধা সৃষ্টি করে না — এসব নজির রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দেখিয়েছেন। তাঁর নিজেরও ব্যাকরণের প্রতি খুব একটা শ্রদ্ধা ছিল না। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তিনি বলেছেন — 'অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলা এবং বোপদেবের সূত্রদ্বয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার মনে হয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।' পণ্ডিত হেরম্ব তর্করত্ন মহাশয়ের মতো পণ্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যও তাঁকে ব্যাকরণ শেখাবার চেষ্টা করে কৃতকার্য হননি। আজ দেশে সরকারি উদ্যোগে 'সংস্কৃত কথোপকথন শিবির', 'সংস্কৃতের মাধ্যমে সংস্কৃত শেখানোর জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ' প্রভৃতি কর্মসূচির কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এসব চর্চা বহুদিন পূর্ব থেকেই আমাদের দেশে চলে আসছে। কেউ কেউ বলছেন সংস্কৃত যখন কোনও কালেই কথ্য ভাষা ছিল না তখন সংস্কৃত কথোপকথন শেখাবার প্রচেষ্টা কেন? এই মন্তব্য সঠিক নয়। পতঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠ করলেই বোঝা যাবে সংস্কৃত এককালে কথ্যভাষা ছিল কি না। শতপথ ব্রাহ্মণে এমন অনেক কাহিনী আছে যাতে বলা হয়েছে সেই আমলে মানুষেরা উত্তরাঞ্চলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শেখার জন্য পড়তে যেতেন। নিরুক্ত ও মহাভাষ্যেও একই কথা বলা হয়েছে যে এক একটি সংস্কৃত শব্দ কথ্যভাষা রূপে এক একটি অঞ্চলে এক এক রকমে ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আগে ভালোভাবে ভাষাটি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, পরে আসা হয় ব্যাকরণের সাম্রাজ্যে। আজ সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্ষেত্রটি নিয়েও ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। ভাষাটিকে সহজ সরল করে সর্ব সাধারণের নাগালের মধ্যে এনে ফেলার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। এ বিষয়ে যিনি পথ প্রদর্শক ছিলেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই রবীন্দ্রনাথ একটি সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার কথা দীর্ঘকাল ধরেই ভেবেছিলেন। সেজন্য ১৮৯৬ সালের ৮ই আগস্ট তিনি ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃত পণ্ডিত বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদক আচার্য হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহায়তায় দু'খন্ডে 'সংস্কৃত শিক্ষা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ সময়ে তাঁর বড় মেয়ে মাধুরীলতার বয়স দশ এবং বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথের বয়স আট। পরবর্তীকালে ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ব্যগ্র হলেন। আর একটি সংস্কৃত শিক্ষার বই স্বয়ং রচনায় উদ্যোগী হলেন। কিন্তু সেটি অর্ধসমাপ্ত রেখে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এটিকে বিধিমতে সমাপ্ত করবার ভার অর্পণ করেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি সম্পাদনার ভার নেন। সেইমত 'সংস্কৃত প্রবেশ' প্রকাশিত হয়। ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — 'বয়স্ক লোকের মধ্যে যাঁহারা ঘরে বসিয়া অল্পকালের মধ্যে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে, আশা করিয়া ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম।'

গোঁড়া পণ্ডিতদের ধারণা বারো বছর ব্যাকরণ পাঠ করার পর ভাষাশিক্ষার প্রস্তুতি শুরু হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১ আশ্বিন ১৩০১ তারিখে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে লেখা একটি চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন — 'আপনার শ্যালক জায়া আর্যা সরলা (সতীশরঞ্জন দাসের পত্নী সরলতা) বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি পড়তে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষা প্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করেছেন — পণ্ডিত মশাই বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুশীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহলে এক বৎসরের মধ্যেই তার সংস্কৃত ভাষার অধিকার জন্মাবে।'

রবীন্দ্রনাথের পর সংস্কৃত কথোপকথন নিয়ে প্রথম ভাবেন কমিউনিস্ট মহাপণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ। তাঁর 'সংস্কৃত পাঠমালা'র পাঁচটি খণ্ড ১৯৬৭ সালে মুম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়। ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ আচার্য ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নানাবিধ পদ্ধতির সহায়তায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উন্নয়ণ সাধন করেছিলেন। কেরলের কামধেনু সংস্কৃত সংস্থা সাতের দশকে চল্লিশ দিনে সংস্কৃত শিক্ষার একটি বই প্রকাশ করে সবাইকে অবাক করে দেন। সংস্কৃত কথোপকথন শিক্ষা প্রশিক্ষণের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে সাতের দশকে। মাত্র দশদিনে সংস্কৃত শিক্ষার এক অভিনব পাঠ্যক্রম আবিষ্কার করেন তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষক ডঃ সদানন্দ দীক্ষিত ও ড. ও ড. চ মু কৃষ্ণ শাস্ত্রী। বর্তমানে

(এরপর ১৩ পাতায়)

সংস্কৃত সম্ভাষণবর্গ (ফাইল চিত্র)।

উজ্জ্বল সংকেত রেখা

★ ভারতে ১২টি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ও নেপালে ১টি অর্থাৎ মোট ১৩টি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে একটি নতুন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

★ ভারতে ১২৫ টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে সংস্কৃত বিভাগ আছে।

★ ২০০-র অধিক মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর সংস্কৃতে এম-এ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

★ দেশে ৫০০০-এর অধিক মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয়।

★ ২৫০-র বেশি আয়ুর্বেদ পাঠশালায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে।

★ 'অষ্টাধ্যায়ী' পদ্ধতিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য দেশে আর্যসমাজ পরিচালিত ত্রিশতাধিক গুরুকুল রয়েছে।

★ বিদ্যাভারতী সঞ্চালিত ২৫০০০ বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে আবশ্যিকভাবে সংস্কৃত পড়ানো হয়।

★ পশ্চিমবঙ্গে সরকার অনুমোদিত ৭০০ সংস্কৃত টোল রয়েছে।

★ দেশে ত্রিশতাধিক বেদ পাঠশালা আছে।

★ দেশে স্নাতকোত্তর স্তরের সংস্কৃতের পারম্পরিক মহাবিদ্যালয় রয়েছে এক হাজারটি।

★ সাতটি রাজ্যে 'সংস্কৃত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড' রয়েছে।

★ রাজস্থান ও উত্তরাখণ্ড রাজ্যে পৃথক সংস্কৃত শিক্ষা নির্দেশালয় রয়েছে।

★ বিহার, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড় রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে (দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণী থেকে) সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশেও এই ঘোষণা হয়েছে।

★ উত্তরাখণ্ড সরকার সংস্কৃতকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

★ গুজরাতে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য। এছাড়া একমাত্র গুজরাত রাজ্যে স্নাতক (বি. এ) পাঠ্যক্রমে সমস্ত বিভাগের ছাত্রদের আবশ্যিকভাবে সংস্কৃত পড়তে হয়।

★ সংস্কৃত ভারতী-র নিরন্তর প্রচেষ্টায় কয়েকটি রাজ্যে ১১ ও ১২ শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার ছাত্রদেরও সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

★ কর্ণাটকে মৈত্রেয়ী গুরুকুলে দশ বছরের মেয়েদের পাঁচ বছর পর্যন্ত সংস্কৃত মাধ্যমে সমস্ত বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।

★ দেশে দশটি সংস্থা সরল সংস্কৃত পরীক্ষা সঞ্চালিত করে।

★ শৃঙ্গেরী, উডুপি, তিরুপতি, পুণে, কাশী, চেন্নাই প্রভৃতি স্থানে পারম্পরিক পদ্ধতিতে শাস্ত্রার্থসভা আয়োজিত হয়।

★ কাঞ্চীমঠ কর্তৃক বিভিন্ন শাস্ত্রে পরীক্ষা এবং বেদভাষ্য পরীক্ষা শাস্ত্র জগতে কঠিনতম পরীক্ষা বলে গণ্য করা হয়।

★ ভারত সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্ত্র ও ধর্ম পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

★ সংস্কৃত ভারতী সংস্থা সাতটি ভারতীয় ভাষায় ডাকযোগে সংস্কৃত শিক্ষা সঞ্চালন করে। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানও ডাকযোগে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

★ সংস্কৃত ভারতী 'সংস্কৃতি সংস্কৃত' পরীক্ষা যোজনায় তামিলনাড়ুতে 'বালভারতী' পরীক্ষায় ১৮০০০ এবং গুজরাতে 'সংস্কৃত গৌরব' পরীক্ষায় ২০০০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করছে প্রতিবছর।

★ দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুকুল কাংড়ী বিশ্ববিদ্যালয়, মহর্ষি মহেশ যোগী বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়, চন্দ্রশেখরেন্দ্র সরস্বতী বিশ্ববিদ্যালয়, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বামী বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থান প্রভৃতি মান্যতাপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহও সংস্কৃতের মহান সেবায় নিযুক্ত আছে।

★ দেশে ১টি দৈনিক সহ ৩০টির বেশি সংস্কৃত পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

★ 'সংস্কৃত আকাদেমি' নামে সাতটি সংস্কৃত সংস্থা রয়েছে।

★ ১০০-র বেশি সংস্কৃত প্রচার পরিষদ রয়েছে।

★ প্রতিদিন রেডিওতে দু'বার এবং দূরদর্শনে একবার সংস্কৃতে সংবাদ সম্প্রচার করা হয়।

★ 'জ্ঞানদর্শন' নামক চ্যানেলে প্রতিদিন সংস্কৃত পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

★ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা প্রতিবছর সংস্কৃত বিদ্বানদের শতাধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত করে থাকেন।

★ কর্ণাটকের মুত্তুরু, হাসহল্লি এবং মধ্যপ্রদেশের মোহদ ও ঝিরী নামে চারটি গ্রাম 'সংস্কৃত গ্রাম' হিসেবে বিখ্যাত।

★ ৩০০০ বেশি সংস্কৃত গৃহ রয়েছে যেখানে গৃহের সবাই সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলেন।

★ ভারতীয় সংসদে বহু সাংসদ সংস্কৃতে শপথ গ্রহণ করেন ও সংস্কৃতে বক্তব্য রাখেন। সংসদে অনুবাদক পদে সংস্কৃত অনুবাদকও রয়েছেন।

★ সম্প্রতি ভারতের সংবিধান সংস্কৃতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

★ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান সংস্কৃত শিক্ষার ২০ টি সি. ডি. প্রকাশ করেছে।

★ তিরুপতির রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের পরিযোজনায় দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুস্তক ইন্টারনেট মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

★ IIT ও IIM Ãপ্রভৃতি সংস্থা সমূহে শিক্ষার জন্য School of Sanskrit Studies আরম্ভ হয়েছে।

★ IIT হায়দরাবাদ, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ হায়দরাবাদ, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান সংস্কৃতকে আধার করে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের জন্য সফট্ওয়্যার তৈরি করেছে।

★ কম্পিউটারে 'আকৃতি' নামে সংস্কৃত ফ্রন্টের জন্য সফট্ওয়্যার তৈরি হয়েছে।

★ সংস্কৃত কম্পিউটার নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে কর্ণাটকের মেলকোট নামক স্থানে 'সংস্কৃত গবেষণা সংস্থার' মাধ্যমে।

★ সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ বেদের কয়েকটি শাখাকে World Heritage ঘোষণা করেছে।

★ বিশ্বে ৬০টি দেশে ৪৫০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা আছে।

★ লণ্ডনের Saint James Independent Schoপ্ত-এ প্রথম শ্রেণী থেকে সংস্কৃত পড়ানো হয়। এখানে পাণিনি ব্যাকরণও পড়ানো হয়।

★ বিশ্বের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে পাণিনি পড়ানো হয়।

★ দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে সংস্কৃত ভাষা স্থান পেয়েছে।

★ আমেরিকার সংসদ ঋগ্বেদের মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে শুরু হচ্ছে ।

★ অধ্যাপক কে. বি. রামকৃষ্ণমাচার্যের মার্গদর্শনে ফরাসী সরকারের সহযোগিতায় প্যারিসে সংস্কৃত ও কম্প্যুটার বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকল্প আরম্ভ হয়েছে।

★ আমেরিকায় সংস্কৃত ভারতী শ্রাবণী পূর্ণিমায় সংস্কৃত দিবস উৎসব পালন করে।

★ থাইল্যাণ্ডের রাজা রাণী ও রাজকুমারী সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারেন।

★ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ১৮টি দেশের ১৮ টি সংস্থা একটি সমবায় গঠন করে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের অধ্যয়ন শুরু করেছে।

★ পশ্চিমবঙ্গে কেবল সংস্কৃত ভাষার ছাত্র-ছাত্রী গবেষক ও পাঠকদের জন্য একটি লাইব্রেরী রয়েছে কলকাতার রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ নামে এই সংস্থায় রয়েছে কয়েক লক্ষ সংস্কৃত বই ও কয়েক হাজার সংস্কৃত পুঁথি।

★ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে সংস্কৃত ভাষার বিশ্বকোষ।

★ কলকাতা 'অর্ঘ্য' নাট্যদানের প্রয়াসে এবছর প্রস্তুত হয়েছে একটি সংস্কৃত নাটক 'মেঘদূতম্'। মনীষ মিত্রের পরিচালনায় এই নাটকের সংগীত পরিচালক পদ্মভূষণ নারায়ণ পানিক্কর। গত ২১ জুন বিড়লা আকাদেমি মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয় এই নাটক। কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে এই নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

★ পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'সত্যানন্দম্' ও 'প্রেক্ষাপট' নামে দুটি মাসিক সংস্কৃত পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

‘নট এ ভাই, নট এ পাই’

“তথ্য-বিচ্যুতি” এই শিরোনামে একটি চিঠি ৩০ শে জুন২০০৮, তারিখে “স্বস্তিকার” চিঠিপত্র কলমে মাননীয় বিমলেন্দু ঘোষ, কলিকাতা - ৬০, মহাশয়ের প্রকাশ পেয়েছে। আমি গত ২৬ মে ২০০৮,তারিখে “স্বস্তিকার” ২ এর পাতায় “ইতিহাসের আলোয় বীর সাভারকর” প্রবন্ধে লিখেছিলাম — গান্ধীজী ডাক দিলেন “নট এ ভাই, নট এ পাই”।

তখন গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসাবে ওই কথাগুলি বলেছিলেন। আমি গান্ধীজীর ঐ উক্তির প্রমাণ দিয়েছিলাম। অপর আর একটি তথ্য বিচ্যুতির কথা মাননীয় বিমলেন্দুবাবু বলেছেন যে, “জাপানে কোনও হিন্দু মহাসভা ছিল না”। এই কথাটি বিমলেন্দুবাবু বলেছেন কারণ আমি উক্ত প্রবন্ধে লিখেছিলাম “নেতাজী সুভাষ বসু অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষ পর্যন্ত জাপানে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন।”

মাননীয় বিমলেন্দু বাবু আপনি দয়া করে শ্রী হৃষীকেশ শীল এর লেখা গ্রন্থ “বিপ্লবী বীর সাভারকর” গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠার ১২ তম লাইনটি পড়ে দেখুন। গান্ধীজী যে ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন তা এই রকম “এক ভাই বি নেহি দেঙ্গে, এক পাই ভি নেহি দেঙ্গে”। ওই একই পৃষ্ঠায় চতুর্থ লাইনে (৮৭ পৃঃ) লেখা আছে “জাপান শাখা হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা মহাবিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুর সহিত বীর সাভারকরের পত্রালাপের গোপন তথ্যও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকে দেখাইয়া ছিলেন, বীর সাভারকর।”

অপর আর একটি গ্রন্থ মণি বাগচি মহাশয়ের লেখা “বীর সাভারকর” গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠার ২৬ তম (শেষ) লাইনে শ্রী হৃষীকেশ শীল মহাশয়ের লেখারই প্রতিধ্বনি করে লিখেছেন “তখন কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে “না এক পাই, না এক ভাই” এই অবাস্তব প্রচার চালিয়েছিল। মণি বাগচি মহাশয়ের ওই গ্রন্থের ২০০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লাইন থেকে পঞ্চ ম লাইনে লিখেছেন “হিন্দু মহাসভার নেতৃত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরে সাভারকর জাপান প্রবাসী রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁরই অনুরোধে রাসবিহারী জাপানে হিন্দু মহাসভার একটি শাখা স্থাপন করেন।”

আমার লেখার পক্ষে অপর আর একটি তৃতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করছি। গ্রন্থটির নাম “দি টু গ্রেট ইণ্ডিয়ানস্ ইন জাপান (শ্রী রাসবিহারী বসু এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু)। গ্রন্থটির লেখক একজন জাপানী। নাম জে. জি অসওয়া, কিন্তু প্রকাশক কলকাতার। কে. সি. দাস, ১২৩/১ আপার সার্কুলার রোর্ড কলকাতা-৬। এই গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় তৃতীয় লাইন থেকে দশম লাইন পর্যন্ত দয়া করে পড়ে দেখুন। আমার লেখার পূর্ণ সমর্থন মিলবে। সুতরাং “তথ্য-বিচ্যুতি” আমার হয়নি। তিনটি গ্রন্থ থেকে তথ্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করলাম।

গোপীনাথ দে, জাঙ্গিপাড়া, হুগলী।

চিঠিপত্র

সংখ্যালঘু

লঘু-গুরু জ্ঞান ভারতবর্ষের কোনদিন হবে কিনা জানি না। সংখ্যালঘু কথাটা এখন সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি বা উস্কানিতে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রদায়িক সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতেই অখণ্ড ভারতবর্ষ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। হিন্দু আর মুসলমানের সংখ্যা বা লোক সংখ্যা দিয়েই তো ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের সৃষ্টি। সুতরাং ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা বেশি হবে এবং পাকিস্তানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হবেই।

যারা দরিদ্র বা দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে আছে তাদের উন্নতিকল্পে কিছু কিছু পরিকল্পনা বা কাজ সরকারের দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা বার বার উল্লেখ করা হয় কেন? বুঝতে পারি না, হিন্দুদের মধ্যে কী এমন লোকের সংখ্যা একেবারেই কম? তবে কেন সংখ্যালঘু বলতে শুধু মুসলমান সম্প্রদায়কে বোঝাতে চাইছেন নেতারা? যারা দরিদ্র বা দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে, সবাইকে এক করলে তারা কি আর সংখ্যালঘু থাকবে না? দারিদ্র্য হিন্দু-মুসলমান সব দরিদ্র শ্রেণীরা এক হয়ে গেলে তারা সংখ্যাগুরু হয়ে পড়বে কি না কে জানে?

তাই বলছি এই সাম্প্রদায়িক উস্কানি এখনই বন্ধ করা হোক, নইলে এই ষাট বছরের স্বাধীনতায় ভারতবর্ষ একটু একটু করে যে ভাবে প্রাদেশিক, ভূমিপুত্র এবং রাজনৈতিক মতাদর্শে পৃথক পৃথক হয়ে চলেছে, হয়তো সেদিন আর বেশি দেরী নয়, যেদিন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ফ্রন্ট গড়েও আর একটা দল ভারতবর্ষে দিল্লীর পার্লামেন্টে বসতে পারবে না — আর তার পরিণাম গণতন্ত্রের মৃত্যু।

প্রাদেশিক দলগুলো আর কম্যুনিস্ট মিলে যদিও চতুর্থ ফ্রন্ট গড়ে তুলতেও সমর্থ হয় তবুও দিল্লী তাদের কাছে দূরে — বহু-যোজনা দূরে। মাঝ থেকে ত্রি-মুখী লড়াই — (১) কংগ্রেস ও তার কিছু প্রাদেশিক দল (কারণ কংগ্রেস যে একা আর দিল্লীর পার্লামেন্ট দখল করতে পারবে না, সেটা তাদের কাছেও পরিষ্কার) (২) বিজেপি বা এন ডি এ, (৩) কম্যুনিস্টদের এই তৃতীয় ফ্রন্ট। ইউ পি এ-র দ্বিতীয় ফ্রন্টের মৃত্যু ঘোষণা করা না হলেও মড়া আগলে বসে আছে — বি জে পি জুজুর ভয়ে।

সে কথাই প্রায় সব দৈনিক পত্রিকা লিখে চলেছে।

হিমাংশু অধিকারী, কলকাতা-২৮

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে আমাদের ক্ষমতা পিশাচ নেতারা (সুশীল পাঠক ক্ষমা করবেন, অর্থ পিশাচ শব্দ যদি থাকে তবে ক্ষমতাপিশাচ এর মতো উপযুক্ত শব্দ চলবে না কেন) যে নেতাজীকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ নেহরু যে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এই কথা আর গোপন নেই। পাপ কখনো চাপা থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এ বিষয়ে এখনও প্রকাশ্যে স্পষ্ট বলতে অনেকে ভয় পান। রাহুল গান্ধী বলেছেন, তাঁদের পরিবারের ত্যাগ ও সংগ্রামে স্বাধীনতা এসেছে। আহা রে, মরে যাই! তাঁদের পরিবারের সবাই যখন আগা খাঁ প্রাসাদে রাজভোগ খেতে খেতে নেতাজীকে কি ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় সেই পরামর্শ করছে তখন অসম সাহসী, প্রাণ হাতে দুর্গম পথে চলেছেন। নির্ভীক বীরপুরুষ —লক্ষ্য একমাত্র স্বাধীনতা, মাতৃভূমির স্বাধীনতা, যার জন্য যথা সর্বস্ব ত্যাগ করতে তিনি প্রস্তুত। ত্যাগ দুঃখ সহিষ্ণুতা উদারতা কোনো দিক দিয়েই আমাদের নেতারা নেতাজীর যোগ্য নন। আজ শুনছি একজন অর্বাচীন বালক বলেছে, স্বাধীনতা এনেছে নেহরু গান্ধি পরিবার-কি করে? আগা খাঁ প্রাসাদে আরাম শয়নে? স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনী লিখবার জোগাড় হচ্ছিল। শিশির বসুর লেখা নেতাজী জীবনী, আমাদের পাইলট প্রধানমন্ত্রী বাতিল করেছেন। কারণ ওতে নেতাজীকে নেহরুর চেয়ে বড় করে দেখান হয় নি!

সেকুলার সেকুলার গর্জনেই কান পাতা দায়। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর শিখ বিরোধী দাঙ্গা রাজীব বন্ধ করতে পারতেন না এ কথা শুনলে ঘোড়া নয় গাধাও হাসবে। এই তো সেকুলারিজম। ভারত আবার কবে জাগবে? কবে জনগণেশ অযোগ্য লোভী নেতাদের শুঁড়ে আছড়ে ফেলবে?

কুন্তলা দত্ত, পূর্বাচল, বিধাননগর, কলকাতা।

গৌরাঙ্গদা

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে মানুষের জড়দেহ পঞ্চ ভূতে বিলীন হয়। গৌরাঙ্গদা ৯ জুলাই এপারের সমস্ত দায়িত্ব, কর্তব্য শেষ করে ওপারের ডাকে সাড়া দিলেন। ওনার মৃত্যু আমাদের কাছে স্বজন বিয়োগ তুল্য, অসুস্থ হওয়ার কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমাদের বাড়ি উনি এসেছেন।

অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে তিনি জীবনের এতগুলি বছর অতিক্রম করলেন। ইংরাজিতে একটা কথা আছে ‘Plain living and high thinking’—উনি তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মা-বাবা-ভাই-বোন সবাইকে ছেড়ে তিনি দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। হিন্দুত্ব রক্ষা করা এবং মানুষকে সঠিক পথে চালানো এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সঙ্ঘ কাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিল অপরিমেয়। নিজের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপস করেননি, সোজা কথা সবসময় সোজাসুজি বলেছেন। তাঁর চলার পথ মসৃণ ছিল না, কিন্তু তিনি কখনও বাঁকা পথ ধরেননি।

প্রচারক হিসাবে তিনি বহু জেলার দায়িত্ব সামলেছেন। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। দৈনন্দিন শাখাকে কেন্দ্র করে বহু পরিবারের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। দেশের জন্য জরুরী অবস্থার সময় তিনি সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনের সব চাওয়া-পাওয়াকে তুচ্ছ করে গৈরিক গুরুর পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন। অর্থাৎ তাঁর জীবনব্রত ছিল — “তোমার কাজে জীবন দেব কথা দিলাম রাজার রাজা”।

আমার আজও মনে পড়ে গৌরাঙ্গদা যেদিন প্রচারক হিসাবে প্রথম বেরোন সেদিন মাননীয় বসন্তদা এবং বাচ্চুদা আমাদের বাড়িতে বসেছিলেন। আমরা ওনার সঙ্গে ওনার বাড়িতে গেলাম জিনিস পত্র আনতে। যখন আমি ছোট ছিলাম তখন গৌরাঙ্গদা আসলে মাঝে মাঝে অঙ্ক দেখাতাম। না পারলে শাস্তি ছিল দুটো আঙুলের মাঝে পেন দিয়ে চেপে ধরা, তখন মনে মনে খুব রাগ হোত। যাই হোক, আজ সব অতীত। শুধু পড়ে থাকে স্মৃতি। স্মৃতির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আজ ক্লান্ত, সব আপনজনেরা আজ শুধুই স্মৃতি। “নিয়তি কেন বাধ্যতে”—নিয়তির সঙ্গে কোনও মোকাবিলা করা যায় না। ফুল তো ফোটে ঝরবার জন্য। ঈশ্বরের কাছে গৌরাঙ্গদার আত্মার শান্তি কামনা করি।

—সাধনা দে, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ো

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে হিন্দু তরুণীরা ধনী নির্ধন নির্বিশেষে “স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ” জানা সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং ধর্মান্তরিত হয়ে মিঞা সাহেবদের শাদী করে তাদের বিবি বনে যাচ্ছে। মুসলিম সমাজের তিন তালাক প্রথা, বহু বিবাহ, পর্দাপ্রথা, শ্বশুর কর্তৃক ধর্ষিতা হলে শ্বশুরকেই শাদী করে স্বামী হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে স্বামীকে সন্তানবৎ প্রতিপালন করা প্রভৃতি বীভৎস বা কুৎসিত প্রথা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের খোলামেলা পরিবেশ পরিত্যাগ করে হিন্দু তরুণীরা কেন মুসলিম সমাজের ঘোরাটোপে বন্দী হচ্ছে তা রহস্যজনক! অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা কোটিপতির মেয়ে প্রিয়াঙ্কা টোডি নিজদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে রিজওয়ানুর রহমানকে শাদী করে তার তিলজলার বস্তিতে এসে বাস করতে আগ্রহী হয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে চলেছে। রিজওয়ানুরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় হয়ে উঠেছিল সারা কলকাতা। কলকাতার রাজনীতিক এবং বুদ্ধি জীবীরা আন্দোলন শুরু করলেন, মৌন মিছিল করলেন, দলে দলে তিলজলা লেনে রিজওয়ানুর রহমানের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে মৃত রিজওয়ানুর রহমানের মা কওসর জাহানকে সমবেদনা জানাতে উপস্থিত হতে শুরু করলেন। বিরক্ত হচ্ছিল রিজওয়ানুরের পরিবারের আত্মীয় স্বজন।

অথচ অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা “মেয়েকে খুনে বাবা, মায়ের যাবজ্জীবন” (আনন্দবাজার ১২.৭.০৮) কোনও গুরুত্বই পেল না রাজনীতিক আর বুদ্ধি জীবীদের কাছে। ঘটনায় প্রকাশ, মুম্বাইয়ের নাগপাড়ার বাসিন্দা মেহনাজ (১৮ বছর) পাড়ার এক হিন্দু ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার অপরাধে মেহনাজের বাবা মহম্মদ মুন্না খান শ্বাসরোধ করে খুন করে নিজের মেয়ে মেহনাজকে। এ ব্যাপারে পিতা মুন্না খানকে সাহায্য করে মেহনাজের মা শেহনাজ খান। এবং বোন গুলজান (১৪ বছর)। এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে পাকিস্তানে আফগানিস্তানে এবং ভারতেও।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে হিন্দু মেয়ে মুসলিম সমাজে সাদরে গৃহীত হলেও একটি মুসলিম মেয়েকেও সমাজ থেকে বেরিয়ে আসতে দেয় না মুসলমানরা। কেউ বেরিয়ে এলে আপ্রাণ চেষ্টা করে মেয়েটিকে মুসলিম সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অন্যথায় তাকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না মুসলিম সমাজ। মুসলিম সমাজের মিনিস্টার থেকে ফিল্ম স্টার, প্রফেসারই হোক বা অফিসার, বুদ্ধি জীবীই হোক বা মৎস্যজীবী, দারোয়ানই হোক বা গাড়োয়ান, পুলিশই হোক বা ফুলিস, সবারই লক্ষ্য থাকে এক এবং অভিন্ন —

জনমত

হিন্দু নারী সংগ্রহ করা। কারণ কোনও অমুসলমানকে ধর্মান্তরিত করে শাদী করলে আল্লাহতালা নাকি তার বেহেস্তের পথ সুগম করে দেন। তাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা বেহালার শর্মিলা ঘোষকে শাদী করল বীরভূমের মল্লাপুরের রফিক উদ্দিন, দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী থানার পড়তি পাড়ার মুজঃফর শাদী করল পাশের গ্রাম দৌলতপুরের সুজাতা চক্রবর্তীকে, দেগঙ্গার মৌসুমী অধিকারীকে কব্জা করল বাদুড়িয়ার বাগজোলার হানিফ, বোলপুরের পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গেঁথে ফেলল ইলামবাজারের জুলফিকার আহমেদ জিন্নাহ্, জুলফিকারের ভাই ইক্‌বাল আহমেদ অন্তরা চট্টোপাধ্যায়কে, মুর্শিদাবাদের নওদার স্কুল টিচার সুস্মিতা মন্ডল তো ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে একজন মুসলমানকে শাদী করে ইসলামের গুণকীর্ত্তন শুরু করে দিয়েছে। প্রিয়াঙ্কা টোডি-রিজওয়ানুর রহমানের শাদীর ঘটনা তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি সব হালফিলের ঘটনা যেগুলি সংবাদপত্রে স্থান পেয়েছে। এসব ছাড়াও অগুনতি ঘটনা ঘটে চলেছে প্রায় প্রতিদিনই। এ সব নিয়ে হিন্দু সমাজে কোনও প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়নি। হিন্দু সমাজ এটাকে পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু একটা সময় ছিল যখন হিন্দু, রমণীরা বিশেষ করে রাজপুত রমণীরা বিদেশী, বিধর্মী, গো-খাদক, মদ্যপ, নারী মাংসলোভী, লম্পট, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী মুসলমানদের এতটাই ঘৃণা করত যে তাদের হারেমে প্রবেশ করে তাদের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার চেয়ে জহরব্রত করে আত্মাহুতি দেওয়া সম্মানজনক বলে মনে করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হিন্দু রাজাদের রাজ্যের হিন্দু রমণীরা অধিকাংশই মুসলমানদের হাতে বন্দিনী হয়ে তাদের হারেমে প্রবেশ করতে বাধ্য হত নয়তো আরবের বিভিন্ন দাস বাজারে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি হত। এ ছাড়াও কিছু হিন্দু রাজা নিজেদের জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসবহুল জীবন যাত্রা, ঠাট-বাট বজায় রাখার জন্য মুসলমান বাদশাহদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে বশ্যতা স্বীকারের নির্দশন স্বরূপ নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের বাদশাহদের দরবারে উপঢৌকন পাঠাতেন। রাজা মানসিংহ তার ভগিনী যোধাবাঈকে আকবরের হারেমে পাঠিয়েছিলেন তার কাছে বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শন স্বরূপ। জয়পুর রাজ ভারমল তিন রাজপুত্রের বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য নিজের কন্যাকে আকবরের হারেমে প্রেরণ করেছিলেন।

বর্তমান যুগের হিন্দু রাজনীতিক এবং বুদ্ধি জীবীরা সম্ভবত রাজা মানসিংহ ভারমল প্রভৃতিদের বংশধর। তাই তাদেরই মতো নিজেদের আত্মীয়াদের মুসলমানদের হাতে অর্পণ করে খ্যাতি,প্রতিপত্তি, সম্মান অর্জন করতে চান এরা। সম্ভবতঃ তাই প্রিয়াঙ্কা

(এরপর ১৩ পাতায়)

একাত্মতার বন্ধন রাখীবন্ধন

অভিজিৎ রায়চৌধুরী

মানব সভ্যতার বিকাশ এবং অগ্রগতির মূলে যে সকল মানবিক ভাবনা আজও সক্রিয় তার অন্যতম পরস্পরকে রক্ষা করার অঙ্গীকার। আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক বিপদ থেকে শুধু নিজে রক্ষা পাওয়া নয় — নিজ গোষ্ঠীভুক্ত জনকেও রক্ষা করা দরকার, এই বোধ মানব মনের এক বিকশিত অবস্থার প্রকাশ। এই বোধ শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালীই করে না উপরন্তু পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। এই অঙ্গীকার আমাদের সাংস্কৃতিক তথা সমাজ জীবনে রাখী বা রক্ষাবন্ধন রূপে পালিত হয়। হিন্দু জীবনে রাখীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিশুর জন্মের পর তার নীরোগ দীর্ঘ জীবনের কামনায় মা বা মাতৃস্থানীয়ারা যে লাল সুতা'র তাগা নবজাতকের হাতে বেঁধে দেন তা রাখীর মৌলিক ভাবনার প্রতিফলন।

হিন্দু সমাজে রাখীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সুপ্রাচীন। পৌরাণিক ঘটনায় দেখা যায় দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রাণী দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে রাখী বেঁধে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন এবং তাঁর বিজয় কামনা করছেন। পুরুর সাথে আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধেও আমরা রাখীর উপস্থিতি দেখতে পাই। সেই রাখী রাজ-মহিষী পুরুর হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন যাতে পুরু স্বদেশ, স্বধর্মকে বিদেশী হানাদারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। মুঘলশাসনাধীন ভারতবর্ষে কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় রক্ষাবন্ধনকে কেন্দ্র করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাখী রাষ্ট্রীয় সংহতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন রাখীবন্ধনের মাধ্যমে প্রবলভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ছোট্ট এক টুকরো হলুদ সুতোর বাঁধন সেই দিন ইংরাজ রাজত্বের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বাংলাসহ প্রায় সমগ্র ভারতে এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। 'আমাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না (The sun never sets in the British Empire), বলে দম্ভোক্তি করতে অভ্যস্ত ইংরাজ জাতি সেই দিন তাদের রাজত্বের অবসান আসন্ন ভেবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। রাজত্ব হারানোর আশঙ্কায় বিচলিত, ত্রস্ত ইংরাজ সরকার তাদের ঘোষিত সিদ্ধান্তকে (Settled Fact) পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ঘটনা (বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য) রাখীবন্ধনকে আশ্রয় করে ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে ইংরাজ সরকার দীর্ঘ সাত বছর প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও ১৯১১ সালে বঙ্গপ্রদেশ বিভাজন পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই রাখীবন্ধন হয়েছিল অক্টোবর মাসে — যাকে অকাল বোধনের (শারদীয়া দুর্গাপূজা) মতো অকাল রাখীবন্ধন বলা হয়।

ঐতিহ্যগত ভাবে রাখীবন্ধনের তিথি হল শ্রাবণ পূর্ণিমা। ঝুলন পূর্ণিমা বলেও এই তিথিটি হিন্দু সমাজে পালিত হয়। রাখীবন্ধন পরস্পরকে রক্ষা করার অনুষ্ঠান। বর্তমানে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান ক্রমশ জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাত্র ৪০/৪৫ বছর পূর্বে এই অনুষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সহ সমমতাদর্শী কয়েকটি সংগঠন এবং বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতীর মতো মুষ্টিমেয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালিত হতো। হিন্দী ভাষাভাষী জনতার মধ্যে অবশ্য রাখী বা রক্ষাবন্ধন সুপ্রচলিত। তবে তা ভাইবোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য নয়। এই অনুষ্ঠানে বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখী বেঁধে ভাইদের সুখ, সমৃদ্ধি, দীর্ঘ-জীবন কামনা করে। রাখীবন্ধনের ব্যাপক সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ্য করে বর্তমানে বহু সংগঠন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের গণ সংগঠনগুলি রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সমস্ত সংস্থার আয়োজিত অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য নিজ নিজ দলের স্বার্থে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করা। রাখীবন্ধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছত্রক্ষজ্ঞনব্ধগ্ন রূপায়িত করা নয়। এই আচরণ আমাদের অবক্ষয়ের দ্যোতক।

জওয়ানদের হাতে রাখী বেঁধে দিচ্ছে মেয়েরা।

বর্তমানে আমাদের দেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন দেশদ্রোহী সংস্থার কার্যকলাপে ব্যতিব্যস্ত। সন্ত্রাসবাদী হানা, বিস্ফোরণ, জাল টাকা ছড়ানো ইত্যাদি দেশের স্থিতাবস্থাকে নষ্ট করছে। সাধারণ মানুষ সন্ত্রস্ত এবং অসহায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষায় নিমগ্ন — অন্য কোনও দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। এর সাথে যোগ হয়েছে নেতা-মন্ত্রীদের কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত মন্তব্য। সব মিলে এক অসহনীয় হাতাশাপূর্ণ পরিমন্ডল দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার নিশ্চিত ও শক্তিশালী উপায় জনমানসে সুতীব্র জাতীয়তাবোধের জাগরণ। যে জাতীয়তাবোধ দেশবাসীর মনে সৃষ্টি করবে তীব্র স্বদেশানুরাগ, দেশের ঐতিহ্য বিষয়ে গর্ব ও শ্রদ্ধাবোধ, সর্বোপরি দেশের জন্য সবকিছু সমর্পণের মনোভাব আর দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা।

যে ঐক্য এবং সাহসের জন্য দেশের মানুষ বিগত শতাব্দীতে দোর্দন্ডপ্রতাপ ইংরাজ শাসককে তার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য করেছিল — মাত্র ৪২ বছর পর দেখা গেল স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে দেশ বিভাজিত হল। কারণ ১৯০৫ সালে যে ঐক্য, সাহস, সততা এবং সবার উপরে তীব্র স্বদেশানুরাগ দেশের মানুষকে উদ্বোধিত করেছিল, ১৯৪৭ সালে তার জোর অনেক কমে গিয়েছিল — ফল দেশ বিভাগ। সেদিনের ভারত বিভাজনে কুশীলবদের উত্তরসূরীরা আজও সমান উৎসাহী ও সক্রিয়। এদের প্রতিরোধ করার সাথে সাথে দেশের সংহতি ও অখন্ডতাকে বজায় রাখার প্রচেষ্টায় সমস্ত দেশবাসীকে যুক্ত করতে হবে। আর এ বিষয়ে রক্ষা বন্ধন যাতে তার স্বকীয় ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষকে সজাগ এবং সক্রিয় হতে হবে।

শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতিধন্য চিত্রকূট

রুদ্র রায়

তাদের কারও বয়স ১২, কেউ একটু বেশি — ৩২ থেকে ৩৫। আবার কেউ বৃদ্ধ। শুধু যে বয়সের পার্থক্য তা নয়। আচার বিচারেও তারা আলাদা। এসবের পরেও চিত্রকূটের মানুষ এক। ধর্মই তাদেরকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। কথায় বলে, 'ধর্ম অর্থাৎ যা ধারণ করে'। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, "আমাদের মাতৃভূমির মূল ভিত্তি একমাত্র ধর্ম। অন্যেরা রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যিক শান্তি, বাহ্যিক স্বাধীনতালাভের অপূর্ব সুখের কথা বলুক। কিন্তু হিন্দু এসব বোঝে না, বুঝতেও চায় না। তার সঙ্গে ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তি — প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা বলুন। অনান্য দেশের অনেক দার্শনিকের চেয়ে আমাদের দেশের সামান্য কৃষকেরা পর্যন্ত এসব তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বেশি জ্ঞানী।" ভারতের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র চিত্রকূটের মানুষের মধ্যে স্বামীজীর এই তত্ত্বেরই প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

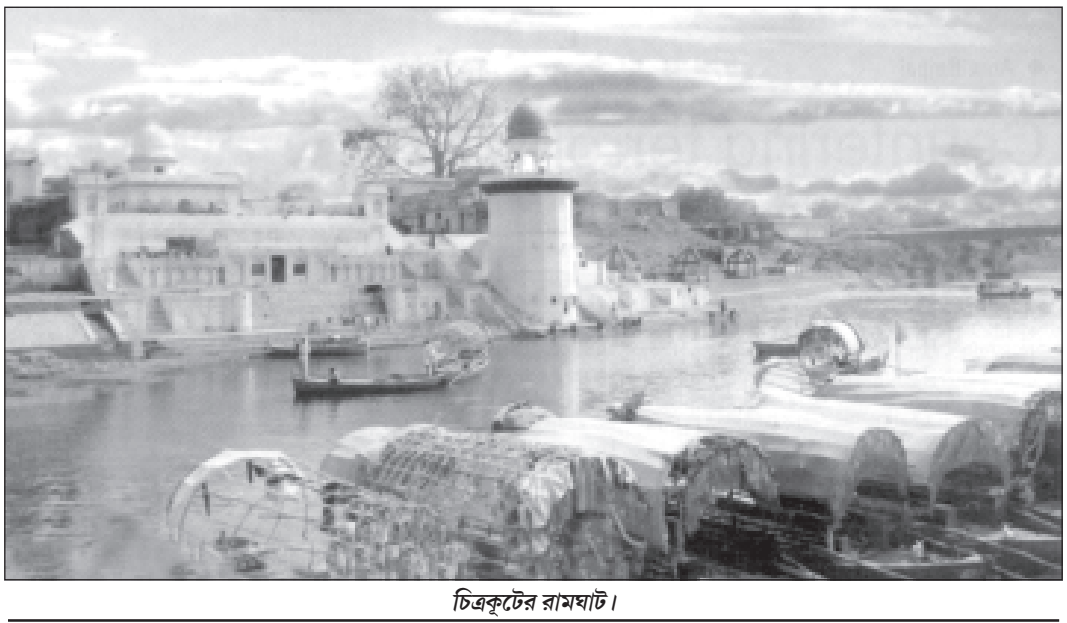

চিত্রকূটের রামঘাট।

মধ্যপ্রদেশের একটি ছোটো শহর চিত্রকূট। চিত্রকূট সম্বন্ধে ইংরেজিতে বলা হয় — 'হিল অফ দি মেনি ওয়ান্ডার' — বিস্ময়ের পাহাড়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের তপঃভূমি চিত্রকূট সাধু সন্তদের চিত্তশুদ্ধির তীর্থক্ষেত্র। ত্রেতাযুগের ধর্মীয় ইতিহাসের বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ চিত্রকূট থেকে পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ১৪ বছর বনবাসের ১১ বছর কেটেছিল চিত্রকূটের অরণ্যে। অযোধ্যার পরেই রামভক্তদের কাছে শ্রদ্ধার ভূমি হল চিত্রকূট। 'আমরা ভাগ্যবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পৃষ্টভূমিতে মানুষ হয়েছি। মা সীতা আমাদের কাছে চিন্ময়ী মা। লক্ষ্মণ-ভরতের পদচিহ্নও আমরা পেয়েছি। আমরা পুণ্যবান — তাই এমন ধর্মীয় ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছি' — কথাগুলো চিত্রকূটের কামতানাথ মন্দিরের এক পূজারীর।

বাল্মীকি রামায়ণে চিত্রকূটের বর্ণনা পাওয়া যায়। হিন্দি ও সংস্কৃতের অনান্য লেখাতেও চিত্রকূটের বর্ণনা আছে। রামচরিত মানসের রচিয়তা তুলসীদাস চিত্রকূট সম্বন্ধে বলেছেন —

"রাম কথা মন্দাকিনী, চিত্রকূট চিত্ত চারু
তুলসী সুভগ সনেহ বন, সিয়া রঘুবীর বিদারু"

রাম কথা হল মন্দাকিনী, চিত্রকূট চিত্তশুদ্ধি। সন্নিহত বন সৌভাগ্যশালী।

রাজা দশরথের আদেশে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ আদেশ পালনে ১৪ বছর বনবাসে যান। পত্নী সীতা, ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থল প্রয়াগে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে পৌঁছান। ভরদ্বাজ মুনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর আশ্রম থেকে ১০ ক্রোশ দূরে চিত্রকূটে নিয়ে যান। চিত্রকূটের পাহাড়-পর্বত অরণ্য ত্রেতাযুগের সেই স্মৃতির সরব সাক্ষী হয়ে

(এরপর ১২ পাতায়)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

নারীর মূল্যায়ণে রামমোহন রায়

অঙ্গনা

অরুণা মুখোপাধ্যায়

রামমোহন রায় হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল — কৃষ্ণনগরের সন্নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ সালের ২২ মে (মতান্তরে ১৭৭৪ সাল) বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত আট বছর বয়সে রামমোহনের প্রথম বিবাহ হয়ে থাকবে; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে এক বৎসরের কম ব্যবধানে অর্থাৎ প্রায় নয় বৎসরে রামমোহনের দ্বিতীয় বিবাহ হয় যেহেতু তখন দেশে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথা দুটির সমধিক প্রচলন ছিল। এই দুই স্ত্রীর নাম ছিল যথাক্রমে শ্রীমতী দেবী ও উমা দেবী। পরিবারে তাঁরা বড়বৌ ও ছোটবৌ নামে পরিচিত ছিলেন ও স্বামীর কাছে তাঁরা দুজনেই পেয়েছিলেন সমান মর্যাদা, যেহেতু নারীর প্রতি রামমোহন ছিলেন শ্রদ্ধাশীল ও মূল্যায়ন বোধ ছিল অসীম।

তখনকার দিনে প্রচলিত প্রথা অনুসারে হিন্দু পরিবারে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর কোন অধিকার না থাকায় রামমোহন নারী জাতির প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৮২২ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিবিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে স্ত্রীলোকদের দায়াধিকার সম্বন্ধে হিন্দু সমাজে যে প্রথা প্রচলিত ছিল তা প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাস্ত্রানুসারে মৃত পতির সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায় পত্নীরও সমান অধিকার— রামমোহনের এই চিন্তা ভাবনাই উত্তরকালে এদেশের হিন্দুসমাজে নারীর মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

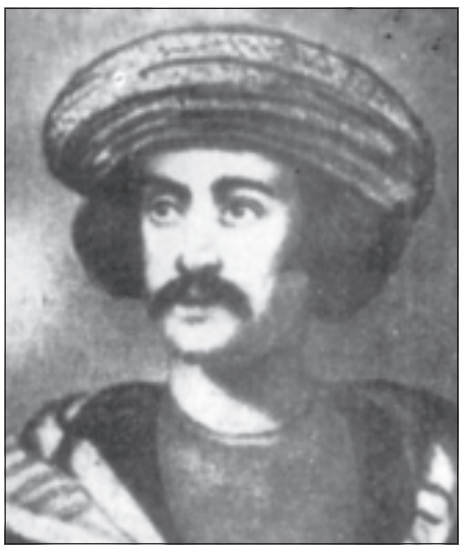

হিন্দু উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহুদিন থেকে দায়ভাগ প্রচলিত ছিল; কিন্তু ১৮২৯-৩০ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি গ্রেসাহেব একটি মামলার নিষ্পত্তিতে মিতাক্ষরা আইন (অর্থাৎ জন্মের ভিত্তিতে অধিকার) অনুসরণ করেন। উত্তরাধিকারীত্বের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে তিনি রায় দেন যে পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করে কোন ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দান বিক্রয় করতে পারবেন না। রামমোহন প্রতিবাদে ১৮৩০ সালে লন্ডনে ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় বক্তৃতা করেন।

সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের উক্তি নারী কল্যাণের সহায়ক ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তাঁর মতে সহমরণ কেবল স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনা মূলক সুতরাং সেটি শাস্ত্রানুসারে গর্হিত কার্য ও অকর্তব্য। অর্থাৎ পতিহারা সতীর পক্ষে মৃত পতির চিতারোহণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য পালনই শ্রেষ্ঠ, রামমোহন এই বিষয়টিই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। বহু শাস্ত্র মন্থন করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন "চিতারোহণ অপরিহার্য নয়, ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন ও ধর্মজীবন যাপন এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুসৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয় তার উপর কোন দোষ বর্তে না।" গীতার তত্ত্ব উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন সহমরণাদি কার্য্যকর্মের নিন্দা ও নিষেধ গীতায় আছে। ঋগ্বেদে যে সহমরণের বিধি নেই রামমোহন এই বিষয়টিও শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নারী সমাজের প্রতি সহানুভূতি ও সেই সমাজের অধিকার আদায়ের দৃঢ় সংকল্প থেকেই রামমোহন সামাজিক আন্দোলনের প্রেরণা পেয়েছিলেন।

রামমোহন নারী জাতির দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহানুভূতির সঙ্গে অনুভব করে ব্যক্ত করেছেন—'আর যাহার স্বামী দুই-তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে। কখনও এমত উপস্থিত হয় যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্বদা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সংসর্গ না পায় তাহারা আপন স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহাদের প্রতি হইলে তাহাদিগকে চোরের মতো তাড়না করে।"

বহুবিবাহ সম্পর্কে "রামমোহন রায় বলেন যে গভর্ণমেন্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অত্যন্ত উপকার হয় যে কোন ব্যক্তি স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন রাজকর্মচারীর নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে তার স্ত্রীর শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোন দোষ আছে। প্রমাণ করিতে সক্ষম না হইলে যে পুনর্বার বিবাহ করিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না।"

রামমোহন হিন্দু নারীর বিষয় সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার সম্পর্কে মত প্রকাশ করে গেছেন। "শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে পুত্রদের ন্যায় সমান অধিকারিণী। বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ বিধানের ফলে স্ত্রী সেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আত্মীয় স্বজনের অধীনে নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে অশেষ মনকষ্টে দিন অতিবাহিত করে। এই দায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থার জন্যই বাংলাদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সহমরণের সংখ্যা এত অধিক।"

নারী পুরুষের ভেদাভেদ ভুলে তিনি মানবিকতার ভিত্তিতে সর্ব মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন ও একইভাবে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, আইন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা তিনি বর্তমান যুগে অত্যাবশ্যক মনে করতেন।

এক কথায় বলতে গেলে রামমোহন নারী সত্তার নিজের বৈশিষ্ট্য জাগিয়ে তুলে নিজের বিরাট সত্তার নিঃসঙ্গ আলোকেই পথ চিনে চিনে শূন্য পথেই এগিয়ে গেছেন।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। বার

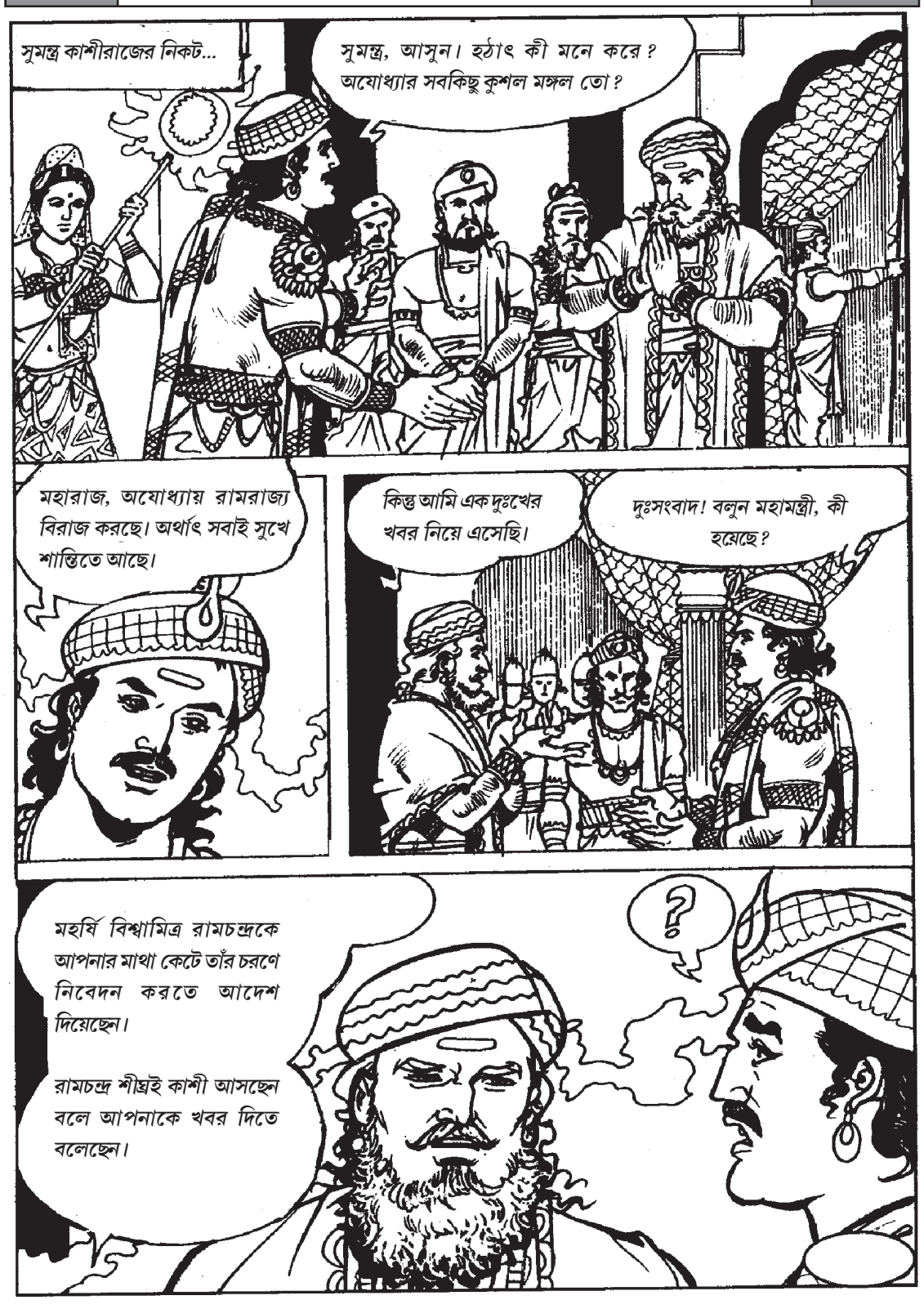

শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতিধন্য চিত্রকূট

(১১ পাতার পর)

রয়েছে।

ভারতের এই ঐতিহ্যময়ী চিত্রকূটের কথা হিন্দি ও সংস্কৃত পন্ডিতদের রচনাতেও লক্ষ্য করা গেছে। তুলসীদাসের জন্মভূমি, কর্মভূমি তথা মানসভূমি এই চিত্রকূটেই। কালিদাসও চিত্রকূটের মহিমা তাঁর রঘুবংশম্ কাব্যের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। পুরাণে বলা হয়েছে, চিত্রকূটেই সতী অনসূয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পালনকর্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্তা মহাদেবকে মাতৃরূপে আপন স্তন্যদান করেছিলেন।

চিত্রকূটের প্রায় সর্বত্রই — রামায়ণ, পুরাণ, বেদ উপনিষদের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাগৈতিহাসিককালের বহু নিদর্শন এখান থেকে আজও সংগ্রহ করে চলেছেন।

এখানে বারও মাসই একটার পর একটা উৎসব চলতে থাকে। তবে দীপাবলী, শরৎ পূর্ণিমা, মকর সংক্রান্তি ও রামনবমী উৎসবের ধূমধাম বেশি হয়ে থাকে। এই সমস্ত উৎসবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা উপাস্থিত হয়। কর্মব্যস্ততার মাঝেও মানুষ আধ্যাত্মিকতার টানে, দু'দণ্ড শান্তির খোজে চিত্রকূটে ছুটে আসেন।

চিত্রকূটে দর্শনীয় স্থান

অনসূয়া আশ্রম

অনসূয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে চিত্রকূটেই গর্ভে ধারণ করেছিলেন। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে সতী অনুসূয়ার এই মন্দির। দু-দণ্ড নীরবে বসে থেকে মনের একাগ্রতা তথা আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে চিত্রকূটের এমন পরিবেশের তুলনা হয় না। শ্রীরাম ও সীতা অনসূয়ার আশ্রমে এসেছিলেন অত্রি ও অনসূয়ার সঙ্গে দেখা করতে। ভরত মিলাপ মন্দির-ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভরতের মিলন এখানেই হয়েছিল। ভরত ও রামচন্দ্রের সেই গৌরবময় স্মৃতিকে তুলে ধরতে গড়ে তোলা হয়েছে ভরত মিলাপ মন্দির। ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন এই ভরত মিলাপ মন্দির।।

হনুমান ধারা ঃ চিত্রকূটের আর এক প্রধান দর্শনীয় স্থান হল হনুমান ধারা। রামঘাট থেকে ৫ কিমি দূরে।

কামতানাথ মন্দির ঃ পর্বত পাদদেশে বিশাল এলাকা জুড়ে এই মন্দির। ৪০ টি সিঁড়ি বেয়ে ভক্তদের মন্দির পৌঁছাতে হয়। সাতনা রাজ্যের পান্না রাজাদের নির্মিত। মন্দিরের গর্ভ গৃহটির দুটি ভাগ —

কামতানাথ মন্দির, অন্যটি হনুমানের মন্দির।

রূপোর মুকুটে শুধু হনুমানের মুখটাই দেখতে পাওয়া যায়। কামতানাথের বিগ্রহের চোখ দুটি সাদা। পুরো বিগ্রহটি কালো।

রামঘাট-তুলসীদাসের ঘাট। গুহার আকারে এটি তৈরি। গোয়ালিয়রের রানী শান্তিবাঈ এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামচরিতের রচিয়তা তুলসীদাসের মানসভূমি ছিল চিত্রকূট। রাজারপুরে তাঁর জন্ম। তুলসীদাস ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পান। জানা যায়, স্ত্রীর কথায় দুঃখ পেয়ে তিনি অভিমানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন ভগবান শ্রীরামের দর্শনের জন্য। হনুমান বৃদ্ধর রূপ ধরে তুলসীদাসকে রামদর্শনের দিশা দেখান। শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন তিনি এখানেই পেয়েছিলেন।

জানকী কুণ্ড ঃ সীতামা'র চরণ চিহ্ন রয়েছে জানকী কুণ্ডের এই মন্দিরে। মন্দাকিনী নদীতে স্নান করার সময় তিনি এই স্থানটি ব্যবহার করতেন। অনাদিকাল থেকে এই তীর্থক্ষেত্রগুলিই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের গৌরবের স্মৃতি কথা। দেশের প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন রূপী এই তীর্থক্ষেত্রগুলিই আমাদের গৌরবান্বিত করে। এমনই এক প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র চিত্রকূট। চিত্রকূটের সঙ্গে সঙ্ঘেরও সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক নানাজী দেশমুখ এখানে জনজাতিদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আপনজন জনজাতিদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে নানাজীর এই উদ্যোগ রামসেবারই মতো পুণ্য কাজ।

এই আমাদের মাননীয় সাংসদ মহোদয়

অমলেশ মিশ্র

মার্কসবাদী মতে ধনতান্ত্রিক দেশের সংসদগুলি হ'ল শুয়োরের খোঁয়াড়। এখন সেই খোঁয়াড়ের নেতৃত্ব নিয়ে চলেছে খেউড়। সে যাই হোক, ভারতবর্ষের সংসদকে এখন

লোকসভাতেই ঘুষের টাকা দেখাচ্ছেন সাংসদরা।

আর খোঁয়াড়ও বলা যাবে না। এখন তো মীনাবাজার আরও স্থূল ভাষায় হাট, খাকুড়দার বিখ্যাত হাট। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র ও সংসদকে যারা এই রকম মীনাবাজার বা খাকুড়াদার হাটে পরিণত করলেন তারা আস্থাভোটে যত ব্যবধানেই জিতুন, দেশের ভবিষ্যৎ যে তাদের হাতে নিরাপদ নয় তা এখন স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। অবশ্য ১২ জন যদি ক্রশ ভোটিং না করতেন তাহলে নিজের শক্তিতে এই আস্থা ভোট বিজয় ছিল অসম্ভব। এই ক্রশ ভোটিং করানোর জন্য যে গোপন লেনদেন হয়েছে তা সংসদেই দেখা গেছে। ক্রশ ভোটিং ছাড়া ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সঙ্গে লেনদেন হয়েছে প্রকাশ্যভাবে। দুই জন সাংসদ তাদের ভাষণেই বলেছেন যে তারা আস্থা ভোটের বিপক্ষেই ছিলেন কিন্তু তাদের এলাকার উন্নয়নের আশ্বাস পেয়ে আস্থা ভোটের পক্ষেই ভোট দেবেন। ৩ জন বিজেপি বিধায়ক টাকার ব্যাগ নিয়েই সংসদে প্রবেশ করলেন এই অভিযোগ নিয়ে যে সরকার পক্ষের এজেন্টরা এই টাকা দিয়ে ভোটে বিরত থাকতে বলছে। আর এক সাংসদ অভিযোগ করলেন সংসদের বিরতির সময় বাইরে গিয়ে তিনি হুমকীর মুখে পড়েন। এত করেও আস্থা ভোটে জয় হ'ত না যদি ১২ জনকে যে ভাবেই হোক ক্রশ ভোটিং না করানো যেত। আর ক্রশ ভোট যারা দিয়েছেন তারা কেন দিয়েছেন তা সকলেই বুঝতে পারছেন। সরকার পক্ষের এই আস্থাভোট চাওয়ার কোনও সাংবিধানিক প্রয়োজনই ছিল না। যদি কোনও পক্ষ মনে করতেন যে সরকার পক্ষ আস্থা হারিয়েছেন তাহলে তাদেরই সেটা প্রমাণ করতে হ'ত সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে। সরকার পক্ষ গায়ে পড়ে আস্থাভোটের প্রসঙ্গ এনে সংসদের ও নিজেদের ভিতরের চেহারাটা দেশবাসীকে বটেই বিশ্ববাসীর সামনেও দেখিয়ে দিলেন। অসামরিক পরমাণু চুক্তি, ১২৩ চুক্তি, হাইড এ্যাক্ট প্রভৃতি বিষয়গুলি দেশের পক্ষে ভাল অথবা মন্দ তা এক সংসদীয় বিতর্কেই স্থির হওয়া উচিৎ ছিল। এটি একটি বা দুটি দলের বিষয় যেমন নয় তেমনি ১ বা ২ বছরের ব্যাপারও নয়। সংসদে খোলাখুলি আলোচনা করে সংসদের মতামত নিয়ে সরকার পক্ষ পদক্ষেপ নিতে পারতেন। তাহলে এই কেলোর কীর্তি ঘটার সুযোগও ছিল না। কিন্তু সরকার পক্ষ এই সহজ সরল ও স্বচ্ছ রাস্তা নেননি। এটি কেবল নিজেদের মধ্যেই কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। ১৪৩ জন দলীয় সাংসদ নিয়ে কংগ্রেস যখন সরকার গঠন করতে গেল মার্কসবাদীদের সমর্থন নিয়ে তখন থেকেই এই লেনদেন রাজনীতি চালু হয়েছে। আস্থা ভোটকে কেন্দ্র করে তা একদম কুৎসিত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই কান্ডে সমাজবাদী পার্টি হঠাৎ স্বাভাবিক বন্ধু মার্কসবাদীদের ছেড়ে কেন কংগ্রেসে ভিড়ল এর পিছনে কী লেনদেন আছে—তাও হয়ত একদিন জানা যাবে।

এই সাংসদ কেনাবেচা এরকম সংকটের ক্ষেত্রে বারবার হয়েছে। এবারও হল। তবে এবারে যা হল তা একাধারে লজ্জাজনক ও রোমহর্ষক। বর্তমান সংসদের ৫৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩৯ জন সদস্য এসেছেন ২০টি পার্টি থেকে।

(ক) ১০টি পার্টি আছে যাদের সাংসদ ১ জন করে।

(খ) ৩টি পার্টি আছে যাদের সাংসদ ২ জন করে।

(গ) ৫টি পার্টি আছে যাদের সাংসদ ৩ জন করে।

(ঘ) ২টি পার্টি আছে যাদের সাংসদ ৪ জন করে।

এছাড়াও আছেন কিছু নির্দল এবং ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার মতো দল। যাদের স্লোগান হল — আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে। সমর্থন যোগাড়ের যুদ্ধে এরাই লেনদেনের লক্ষ্য। অথচ এই চুক্তিটিকে প্রথম থেকেই যদি সংসদের এক্তিয়ারে আনা হত এবং সংখ্যাধিক্যের মত গ্রহণের নীতি নির্দ্ধারিত হত তাহলে এই কেলেংকারী হত না।

লোকসভার অধ্যক্ষ যতই সম্বোধন করুন — 'মাননীয় সাংসদ মহোদয়' বলে, সংসদের সাংসদেরা যে কতটা মাননীয় তা নীচের পরিসংখ্যানটি প্রকাশ করছে।

বর্তমান ৫৪৩ জন সাংসদ লোকসভায়। দু'জন মনোনীত হন। মোট সংখ্যা ৫৪৫।

(ক) এদের মধ্যে ৬ জন আপাতত জেল খাটছেন — বিভিন্ন অভিযোগে অপরাধী প্রমাণিত হয়ে। এদেশের গণতন্ত্রের এমনই মহিমা যে এরাও সংসদে আস্থা ভোটে ভোট দিয়েছেন অর্থাৎ এদের সাংসদ পদ অক্ষুণ্ণ।

(খ) ১১৭ জন সাংসদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, চাপ দিয়ে অর্থ সংগ্রহ, ডাকাতি ও আক্রমণের অভিযোগ আছে। অভিযোগগুলি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে।

(গ) ১৯ জন সাংসদের বিরুদ্ধে অন্তত ৩টি করে ফৌজদারী মামলা চলছে।

(ঘ) ২১ জনের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে নির্যাতন করার অভিযোগ আছে।

(ঙ) ৭ জনকে লোক ঠকানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(চ) ৭১ জনকে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দেয় না যেহেতু এদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়েছে।

(ছ) ২১ জন জমি সংক্রান্ত মামলায় বিবাদী পক্ষ অর্থাৎ এদের বিরুদ্ধে জমি আত্মসাৎ বা চুরির অভিযোগ।

(জ) ৮৪ জন বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত

(এরপর ১৪ পাতায়)

বিজ্ঞান ও সংস্কৃত

(৮ পাতার পর)

২। Artificial Intelligence Magazine, Spring Issue, 1985, NASA.

৩। মানুষের নিত্যব্যবহারের ভাষা হল প্রাকৃতিক ভাষা।

৪। বাক্য গঠনের জন্য পদবিন্যাসের নিয়ম।

৫। একটি বাক্যবিশেষে একটি শব্দের অর্থ বা তাৎপর্য।

৬। একটি যান্ত্রিক ভাষার আন্তরিক নির্মাণ ও শৈলী।

(লেখক রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, তিরুপতি-তে গবেষণারত)

সংস্কৃত সম্ভাষণ

(৯ পাতার পর)

এই পাঠ্যক্রমই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত এবং জনসমাদৃত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —'ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা ভাষাশিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি মনে করি না।' তাই ব্যাকরণ শিক্ষা নয় প্রাথমিক স্তরে সংস্কৃত শেখানোর জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির চলছে কয়েক বছর ধরে। ভারত সংস্কৃত পরিষদ, লোকভাষা প্রচার সমিতি ও সংস্কৃত ভারতী এই কাজে ব্রতী হয়েছে। মাত্র দশদিনে সংস্কৃত ভাষায় সামান্য হলেও কথা বলা যেতে পারে এই পদ্ধতিতে। যাঁদের ধারণা সংস্কৃত ভাষা এখন ডেড এন্ডে পৌঁছে গেছে তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে ত্বট্টত্রট্ট ঘোষণা করেছে এখন অতি উন্নতমানের ফিফথ্ জেনারেশন কম্পিউটার শিক্ষার প্রশিক্ষণ নিতে গেলেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক। কারণ এতে বোতাম টিপে কাজ করার সুযোগ নেই, শুদ্ধ ভাবে যা বলা হবে কম্পিউটার কেবল তাই গ্রহণ করবে।

আবার শুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃতের ধারে কাছে কোন ভাষাই নেই। তাই ফিফ্থ জেনারেশন কম্পিউটার ভারতে আসার পূর্বেই সংস্কৃত ভাষাটা শিখে নেওয়া আবশ্যিক নয় কি?

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

(১০ পাতার পর)

টোডিকে প্রিয়াঙ্কা রহমান করা গেল না এই শোকে কঁকিয়ে উঠেছেন, আর্তস্বরে চিৎকার করছিলেন কিছু রাজনীতিক এবং বুদ্ধি জীবী।

মুসলিম সমাজ কিন্তু বিষয়টা এত সহজ ভাবে নেয় না, যদি কোনও মুসলিম তরুণী কোনও হিন্দুকে বিবাহ করে হিন্দু হতে চায়, পার্ক সার্কাসের তিলজলা রোডের বাসিন্দা সোফিয়া বারাসাত থানার ছোট জাগুলিয়ার দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করলে সোফিয়ার বাবা হায়দার এবং দাদা টিপু দেবব্রতকে খুনের হুমকি দেয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার নোদাখালি থানার রেজিনা খাতুনকে ঝাড়গ্রামের দোদন পাত্র বিবাহ করলে পাত্রী বা পাত্র কোন পক্ষই এ বিবাহ মেনে নেয়নি। কালনার বিকাশ পিঙ্কি খাতুনকে বিবাহ করলে তাদের সমাজচ্যুত করা হয়। কটা সংবাদই বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়?

ফিরে আসা যাক, রিজওয়ানুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায়। মৃত্যু সর্বদাই বেদনাদায়ক। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা তো অবশ্যই। কলকাতা শহরে এবং আশেপাশে এর আগে অনেক অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তখন কিন্তু কলকাতার রাজনীতিক এবং বুদ্ধি জীবীদের এত বিচলিত, এত শোক জর্জরিত হতে শোনা যায়নি। প্রচার মাধ্যমেও এতটা তৎপর ও সক্রিয় ছিল না তখন। ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল বেলা ১০টায় কলকাতায় বিজন সেতুতে ১৭ জন আনন্দমার্গীকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল। তখন কিন্তু এত শোরগোল এত হৈ চৈ হয়নি, কারও কোন্ শাস্তিও হয়নি। ১৯৯১ সালের জুন মাসে কলকাতার উপকণ্ঠে বানতলায় সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী অনিতা দেওয়ান এবং তাঁর গাড়ি চালক অবনী নায়ারকে নৃশংসভাবে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছিল, আরও দুই মহিলা কর্মীকে নৃশংসভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল। অবশ্য ঐ দুই মহিলা কর্মী রেণু ঘোষ এবং উমা ঘোষ প্রাণে বেঁচে যান। ঐ তিন মহিলার বিবস্ত্র নিথর দেহ প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায় পড়েছিল কয়েক ঘন্টা। তারপর পুলিশ এসেছিল। সব কিছু শুনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসু মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন "ও রকম তো কতই হয়ে থাকে"। যা কোনও সভ্যদেশে কখনও হয় না সেই ঘটনার পরও এদেশের বুদ্ধি জীবী আর রাজনীতিকরা মুখে কুলুপ এঁটে মৌনী বাবা সেজে বসেছিলেন। কারণ ওই বানতলার ঘটনার কুশীলবরা ছিল সবাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। আবার ২০০২ সালে গুজরাটের গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় ৫৯ জন যাত্রীকে যখন জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল তখনও এইসব রাজনীতিক এবং বুদ্ধি জীবীরা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু কেন? আর এখনই বা রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুর ঘটনায় এঁরা এত শোরগোল তুললেন কেন? প্রিয়াঙ্কা টোডিকে প্রিয়াঙ্কা রহমান করা যাচ্ছে না বলে?

পিতা মাতা তার পুত্র কন্যাদের জন্মের পর থেকেই পরম যত্নে নিবিড় স্নেহ দিয়ে বুকে আগলে ধীরে ধীরে বড় করে তোলে, তাদের ঘিরে আশার স্বপ্ন দেখে। প্রিয়াঙ্কার পিতা অশোক টোডি আর দশজন পিতার মত এক স্নেহপ্রবণ পিতা। তিনি একটি মুসলিম ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ সঙ্গত কারণেই মেনে নিতে পারেননি। পিতার হৃদয়ের কোমলতম স্থান যে মেয়ে অধিকার করে আছে ২০/২৫ বছর ধরে, সে যদি হঠাৎ পিতা মাতার সব স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, দলিত মথিত করে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের একজনের সঙ্গে চলে যায়, সম্প্রদায়, সমাজ, ধর্ম, আর্থিক শ্রেণী বিন্যাস কোনও দিক দিয়েই যার সঙ্গে কোনও মিল হয় না তাহলে স্নেহ -প্রবণ পিতা মেয়েকে নিজের পরিবারে ফিরিয়ে আনতে সবরকম ব্যবস্থাই নিতে পারেন এবং অশোক টোডি, ঠিক তাই করেছেন। অর্থ দিয়ে পুলিশ প্রশাসন সবাইকেই কাজে লাগিয়েছেন। মেয়েকে নিজের পরিবারে ফিরিয়ে এনেছেন। এতেই গেল গেল রব তুলেছিল তথাকথিত কিছু বুদ্ধি জীবী তক্মাধারী এবং রাজনীতি ব্যবসায়ী। তক্মাধারী বুদ্ধি জীবীদের আশা এ সমস্ত করে তারা বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করে বিদেশে আমন্ত্রিত হবেন নানা রকম পুরস্কার এবং উপঢৌকন লাভ করবেন। আর রাজনীতি ব্যবসায়ীদের আশা তারা মুসলিম ভোট কব্জা করে প্রশাসনিক, ক্ষমতার অধিকার লাভ করবেন। "ধন্য আশা কুহকিনী"।

সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে - হাতে মাত্র ৪০টি বছর

বিগত ৬০ বছর ধরে দেশ-শত্রুদের ক্রমবর্ধমান দেশদ্রোহিতা এখনই কঠোর হস্তে দমন না করলে, অচিরেই খণ্ডিত ভারত শত্রু-কবলিত হবে। এই নির্মম সত্যটি উপলব্ধি করার জন্যে

ফা হিয়েনের **'বিলুপ্তির পথে হিন্দু'** - ১৫০্

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর **'হিন্দুর শত্রু হিন্দু'**-৬০্

শীর্ষক পুস্তক দুটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

◆ দে বুক ষ্টোর-কলেজ স্ট্রীট ◆ সর্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন

খেলার জগৎ

স্বমহিমায় জিব মিলখা সিংহ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় একবছর পর পেশাদার গলফ সার্কিটে কোনও খেতাব জিতেলন জিব মিলখা সিংহ। কদিন আগেই কিংবদন্তী টেনিস তারকা বিজয় অমৃতরাজ -তনয় প্রকাশ অমৃতরাজ যুক্তরাষ্ট্রের হল অব ফেম টেনিস টুর্ণামেন্টে রানার্স হয়েছেন। আর তার কদিন পরই এদেশের সর্বোত্তম অ্যাথলিট ও রোম অলিম্পিকে শিহরণ সৃষ্টিকারী মিলখা সিংহের ছেলে জিব মিলখা সিংহ জিতে নিলেন জাপানের নাগাসিমা সেইগো মেগা সামে আমন্ত্রণী গলফ প্রতিযোগিতা। হোক্কাইডোর নর্থ কান্ট্রি গলফ ক্লাবে আন্ডার সিক্সটি সিক্স স্কোর করেন ফাইন্যাল রাউন্ডে। যা চূড়ান্ত পর্যায়ে তার মানসিক দৃঢ়তা ও নিবিড় মনসংযোগের পরিচয় বহন করার পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে।

এর আগে ২০০৬ -এ টোকিওর গল্ফ নিপ্পন সিরিজে জে টি কাপ জিতেছিলেন। জাপান গলফ ট্যুরে ওই খেতাব জিতে জিব এশিয়ান টুর অর্ডার অব মেরিট বা এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গলফ খেলোয়াড়ের মর্যাদামন্ডিত স্বীকৃতি পান। সেবছরই তিনি জিতেছিলেন ঐতিহ্যবাহী ভলভো মাস্টার্স। ইউরোপিয়ান পি জি এ ট্যুরের এই খেতাবটি বিশ্বের প্রতিটি গলফারের পাখির চোখ বলে গণ্য হয়। এবছরও জাপানে খেতাব জেতার আগে একটি ইউরোপিয়ান খেতাব জিতে এসেছেন। অস্ট্রিয়ার ব্যাঙ্ক অস্ট্রিয়া ওপেন গলফ টুর্ণামেন্ট জিতে জিব জানিয়ে দেন ২০০৭-র খারাপ সময় কাটিয়ে উঠে আবার তার পুরনো ফর্ম ফিরে পেয়েছেন।

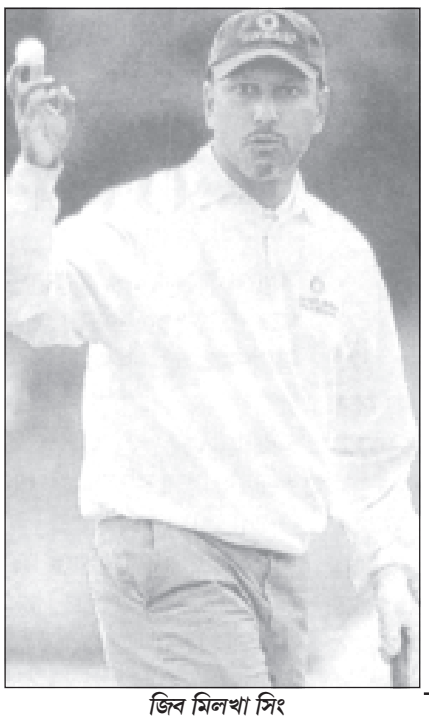

জিব মিলখা সিং

জিব মিলখাই প্রথম ভারতীয় পেশাদার গলফ খেলোয়াড় যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেশাদার গলফ সার্কিট অর্থাৎ ইউ এস পি জি এ ট্যুরে খেলার সুযোগ আদায় করে নিয়েছেন। তিনি প্রথম গলফার যিনি পেশাদার সার্কিটে প্রথম পঞ্চ মে স্থান পেয়েছেন একের পর এক বড় মাপের টুর্ণামেন্ট জিতে দু'বছর আগে।

গত বছর অবশ্য সেভাবে সাফল্য না পাওয়ায় র‍্যাঙ্কিংয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেছেন। এবছর মেজর টুর্ণামেন্টে ভাল করে আবার প্রথম পঞ্চ মে ঢুকে পড়তে চান। তার জন্য অনুশীলন বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাছাবাছা টুর্ণামেন্ট খেলছেন এবং সাফল্যের জন্য একটা লক্ষ্যমাত্রাও স্থির করে ফেলেছেন।

বিশ্বকাপের থেকেও কঠিন অলিম্পিক ঃ দুঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। 'নিঃসন্দেহে প্রথম অলিম্পিক সোনার পদক জেতার গুরুত্ব বিশ্বকাপ খেতাবের থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। পাঁচবার আমরা বিশ্বকাপ জিতেছি, কিন্তু দুবার অলিম্পিক ফুটবল ফাইনাল খেলে রূপোর পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এবার আমরা সোনার অন্যতম দাবিদার। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এক সুসম ভারসাম্যপূর্ণ দল নিয়ে বেজিং এসেছি। তাই প্রথমবার এই সোনাটি জেতার জন্য ছেলেরা সর্বশক্তি দিয়ে লড়বে। আর এই পদক জেতার ব্যাপারটা বিশ্বকাপ চাম্পিয়ন হওয়ার থেকেও কঠিন। কারণ এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় সমানে সমানে হয়।' ব্রাজিল কোচ কার্লোস দুঙ্গার এমনই ধারণা। রোনাল্ডিনহো, সিলভার-এর মতো বিশ্বকাপার রয়েছে এবারের ব্রাজিল দলে। অসামান্য প্রতিভাধর পাতোর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ব্রাজিল। মাঝমাঠকে প্রায় একাই নিয়ন্ত্রণ করেন কুড়ি বছরের এই তরুণ। ভবিষ্যতের ব্রাজিলের জাতীয় সম্পদ হতে চলেছেন পাতো, মনে করেন দুঙ্গা। তবে দুঙ্গার মতে ব্রাজিলের প্রস্তুতি আরও কিছু আগে থেকে শুরু করলে অনেক বেশি শাণিত অবস্থায় পাওয়া যেত ফুটবলারদের। ব্রাজিল দলের অধিকাংশ ফুটবলার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে খেলেন। তাদের ছাড়তে ক্লাব কর্তৃপক্ষ গড়িমসি করায় ব্রাজিল শিবির শুরু করতে পারেনি ঠিক সময়।

উল্লেখ্য, বেজিংয়ে আসার আগে ব্রাজিল সিঙ্গাপুরে তাদের শেষ পর্বের শিবির করে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছে। বেজিংয়ের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের আবহাওয়ার সাদৃশ্য থাকায় এই সিদ্ধান্ত— ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। এতে যথেষ্ট উপকারই হয়েছে দলের বলে মনে করেন দুঙ্গা। সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন তারা সিঙ্গাপুর জাতীয় দলের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলেছে এবং সহজেই জয় পেয়েছে। এরপর ভিয়েতনামে গিয়ে তাদের জাতীয় দলের বিরুদ্ধেও খেলে এসেছে ব্রাজিল। অলিম্পিকে যদিও অনেক বেশি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে, তথাপি সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনাম ম্যাচ দুটি ব্রাজিল দলের প্রস্তুতিতে বাড়তি মাত্রা সংযোজন করেছে। ১৯৮৪, ৮৮ পরপর দুটি অলিম্পিকে ফুটবল ফাইনাল খেলা ব্রাজিল বেজিং থেকে অধরা সোনাটি তুলতে বদ্ধ পরিকর।

মাননীয় সাংসদ

(১৩ পাতার পর)

হয়ে জবিমানা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

(এই তথ্য কলামিস্ট রাজিন্দার পুরী ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেছেন)।

এই মাননীয় সাংসদ মহোদয়রা আমাদের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। এই 'মাননীয় সাংসদ মহোদয়'রা আমাদের দেশ শাসন করেন। ফলে আস্থা ভোট বা অনাস্থা ভোট কোনও ভোটেই কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে এদের মতামত ক্রয় করা অসম্ভব নয়। এ বাবদে যা ব্যয় করতে হয়, আস্থা বা অনাস্থা ভোটে যারা জয়ী হন — তারা সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে তা তুলে নিতে পারেন এমন সম্ভাবনাও থাকছে। ২১ এবং ২২ জুলাই সংসদ অধিবেশন চলাকালীন স্পিকার বারবার আক্ষেপ করছিলেন, এই যদি সংসদ ও সাংসদ হয়, না জানি এদেশের ভবিষ্যৎ কী? এটি অত্যুক্তি বলে মনে হয় না।

ফিনাকে বিঁধলেন শ্যেন গোল্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শ্যেন গোল্ডকে মনে পড়ে? সেই প্রতিভা, সুন্দরী অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু, যিনি ১৯৭২-র মিউনিস অলিম্পিকের সাঁতারের পুলে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। তিনটি ইভেন্টে নেমে প্রত্যেকটিতেই বিশ্বরেকর্ড সহ সোনা জিতে দুনিয়ার তৎকালীন জলপরীর সম্মান অর্জন করে নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পূর্ব জার্মানির কর্ণেলিয়া এন্ডারের দ্বৈরথ রূপকথার মিথ হয়ে আছে। এহেন শ্যেন গোল্ড কিন্তু সাঁতারের পুল থেকে সাঁতারের পোষাকের আধুনিকীকরণে একেবারেই খুশি নন।

অলিম্পিকের আনন্দমঞ্চে মেতে আছে বিশ্ব সমাজ। এর মধ্যেই বোমা ফাটালেন গোল্ড। সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন , তার মনের কথা। 'আমাদের সময়ে যে ধরনের সুইমস্যুট পরে সাঁতারুরা জলে নামতেন তাতে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যথেষ্ট লড়াই করে নিজেদের জাত মেলে ধরতে হত। ফলে প্রতিটি লড়াইয়ে স্বচ্ছতা ও মাত্রা বজায় ছিল। আর এখন যে ধরনের 'স্পেস এজ' সুইম স্যুট পরার সুযোগ পাচ্ছে সাঁতারুরা, তার ফলে জলে তাদের গতি, রিফ্লেক্স বেড়ে যাচ্ছে। পারফরমেন্স অনেক উন্নত হচ্ছে প্রযুক্তিগত সুবিধের জন্য। আন্তর্জাতিক সাঁতার সংস্থা বা ফিনা এই ব্যাপারটা কি করে স্বীকৃতি দিল, তা আমার মাথায় ঢুকছে না'।

উল্লেখ্য, এই ধরনের সুইমস্যুট দেখে সাঁতারুরা কিন্তু যারপরনাই উল্লসিত। এর ফলে জলে অনেক মসৃণভাবে মাথা না তুলে স্ট্রোক করে এগিয়ে যাওয়া যায়। বিশেষ করে টার্নিংয়ের সময়, যখন শরীরের মোচড়ে অনেকটা জায়গা 'কভার' করে ছিটকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। প্রযুক্তির এটা ব্যবহার না অপব্যবহার? সাঁতারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণগত উৎকর্ষতা তা কমিয়ে দেবে বলে গোল্ডের ধারণা। তিনি মনে করেন, হাল আমলের চাম্পিয়ন সাতাঁরুদের তুলনায় তাদের সময়ের সেরা সাতাঁরুদের প্রয়োগিক দক্ষতা স্বভাবতই বেশি ছিল। তাদের যোগ্যতা ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রকৃতিদত্ত কোনও সুযোগ সুবিধের দরকার হয়নি। ফিনার এই সিদ্ধান্ত সাঁতারুদের বাড়তি সুবিধা ভোগ করার ব্যাপারটা তাই না পসন্দ গোল্ডের।

শব্দরূপ - ৪৭৬

কবিতা চৌধুরি

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. ইঙ্গ শব্দে শক্তিশালী বানর জাতীয় প্রাণী, প্রথম ঘরে একাক্ষরী গরু, ৪. একই নামে রামকৃষ্ণ দেবের পত্নী, সরস্বতী, দুর্গা, ৭. প্রতি শব্দে বিজেতা, নিয়ন্ত্রণ পীড়ন, শেষ দুয়ে হৃদয়, ৮. তৎসম শব্দে সুর্মা, প্রথম দুয়ে পৃথিবী, দুয়ে-চারে ইঙ্গ সূর্য, ৯. দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক শিল্পাঞ্চ ল, ১০. এখানে দৃষ্টি দিতে হবে, ১১. আরবি শব্দে জমির মাপ জোক, জমির পরিমাণ নির্ণয়, ১৩. যতনে—মেলে, পূরণীয় স্থানে রত্ন।

উপর-নীচ ঃ ১. বঙ্গীয় শব্দে লেড, প্রথম ঘরে ইঙ্গ তৃতীয় বর্ণমালা, ২. তৎসম শব্দে গুপ্ত, লুকানো, ৩. চিত্রলক্ষণ, ষড়ঙ্গ, প্রথম দুয়ে বটের পাখি, শেষ দুয়ে শ্রমিক, ৫. ফারসি শব্দে বায়না, অগ্রিম মূল্য বা পারিশ্রমিক, ৬. গৃহস্থালি, গার্হস্থ্য, দুয়ে পাঁচে পৃথিবী, তিনে-ছয়ে দুধের আস্তরণ, ৯. আরবি শব্দে ছাউনি ঘেরা পানের ক্ষেত, ১০. একই শব্দে পুত্র, স্বর্গের উদ্যান, ১২. রাস্তা।

সমাধান শব্দরূপ ৪৭৪

স্প	ষ্ট	বা	দি	তা	■	■	স
ন্দ	■	■	দি	■	গি	টা	র
ন	বি	■	মা	থা	■	■	পুঁ
■	টে	■	■	বা	টি	ঘ	টি
স	ল	ম	ন	■	■	রা	■
হ	■	■	গ	দ	■	মি	হি
ক	লে	জ	■	র	■	■	ন্দো
র্মী	■	■	ক	দ	ম	চা	ল

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬
দেবলীনা গঙ্গোপাধ্যায়
হাওড়া, চারাবাগান।
বীরেন মাইতি
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২৫ আগস্ট ২০০৮ সংখ্যায়।

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক - ২০০.০০ টাকা

গহনা যদি গড়াতে চান যে
কোনও স্বর্ণকারকে
সুপার
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণ হাটা স্ট্রীট, কলি - ৬

চিটিংবাজদের রাজত্ব

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য

অবশেষে কালিরামদের ঢোল ফেঁসে গেল। ধাপ্পাবাজদের ধাপ্পাবাজি যে বেশিদিন চাপা থাকে না তা আবার প্রমাণিত হলো। সিঙুরের জমি যে ধাপ্পাবাজি করে নেওয়া হয়েছে তা দিনের আলোর মতোই সত্য। পুলিশ দিয়ে লাঠি চালিয়ে, তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে, অবশেষে জমি দখল যে বৈধ তা রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়কে দিয়ে বৈধতার সিল লাগিয়েও শান্তি ফেরানো গেল না। কারণ আইন তার নিজের কলা কৌশলে চোরকে নিরপরাধ বললেও সিঙুরের মানুষ অপরাধীদের চিনে ফেলেছে। হাইকোর্ট কর্তৃক জমি দখলের বৈধ সার্টিফিফেট গলায় ঝুলিয়েও সিঙুরের মানুষের মন জয় করা যায়নি, তাই পঞ্চায়েতে সিঙুরের মাটি থেকে উৎখাত হতে হয়েছে জমি দখলকারীদের। হারামে জমি মিললেও স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা না পেলে যে শিল্প গড়া যায় না তা এতদিনে সবাই বুঝে গেছেন। কিন্তু তারা এতদিন ন্যাকা সেজে ছিলেন কেন? অশান্ত সিঙুরের চেহারা দেখে চাপে পড়েই এবার বিরোধী শিবিরের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার প্রস্তাব দিচ্ছেন টাটা মোটরস - এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার রবিকান্ত। আজ সিঙ্গুরে উন্নয়নের ফায়দা তুলতে আহ্বান জানাচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী। কিন্তু মমতা ব্যানার্জী যখন সিঙুর নিয়ে অনশনে বসেছিলেন তখন কোথায় ছিলেন রবিকান্তেরা?

তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল দখল করা জমির ভেতর। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারেই ধর্ষণ করে খুন করা হয় তাপসীকে। এতসব ঘটনা যখন ঘটছে তখন কোথায় ছিলেন রবিকান্তেরা? মমতা সহ সিঙুরের মানুষকে দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে পুলিশ — তখন কোথায় ছিলেন রবিকান্তেরা? সিঙুরের মানুষের কাছে এজন্য কি তাঁরা আজ ক্ষমা চাইতে রাজী আছেন? আজ তাঁরা কেন বলছেন আমরা সিঙুরের মানুষের সাথী! সিঙুরের মানুষের বিপদের দিনে তাঁরা চোখে ঠুলি পরেছিলেন কেন? কোনও সত্যিকারের সাথী বন্ধু কি বন্ধুর সর্বনাশ করতে পারে? সিঙুরের মানুষ রবিকান্তদের সাথী বলে মনে করে না। কারণ রবিকান্তদের লোভের বলি তারাই। রবিকান্তদের জন্যই তাদের সুখের ঘরে আগুন লেগেছে। আর এজন্য রবিকান্তরা সিঙুর এলেই গ্রামের মানুষ অশান্ত হয়ে ওঠে, গ্রামের মেয়েরা জুতো ঝাঁটা নিয়ে স্বাগত জানায়। টাটা মোটরস সিঙ্গুরের অঙ্গ হিসেবে প্রচার করলেও সিঙুরের মানুষ তাকে সিঙুরের কলঙ্ক বলেই মনে করে।

একদিন সিঙুরে যারা বড় গলা করে বলেছিল 'স্বেচ্ছায় জমি দিলে টাটার চাকরি' তারা আজ কোথায়? ধাপ্পা দিয়ে যে বেশিদিন চলে না তা আবার পরিষ্কার হলো। ট্রেনিং নিয়েও যে টাটার কারখানায় বা অনুসারি শিল্পে চাকরি হবে না তা আজ পরিষ্কার। রাজ্য শিল্প নিগম এবং স্থানীয় সি পি এম নেতারা ধাপ্পা দিয়ে কিছু লোকের থেকে স্বেচ্ছায় জমি হাতিয়ে নিয়েছেন তা দিনে দিনে পরিষ্কার হচ্ছে। ইতিমধ্যে সিঙুরে যাদের একদিন জমির পাহারাদার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল এমন ৭০০ যুবককে চাকরিচ্যুত করেছে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম। টাটা প্রজেক্টে ৭০০ জন স্থানীয় পাহারাদার যুবকদের মধ্যে ২৮০ জন সিঙ্গুরের বেড়াবেড়ির, ২৮০ জন গোপালনগরের ও ১৪০ জন সিঙুরের অন্য অঞ্চলের বাসিন্দা। রাজ্য শিল্প নিগম কর্তারা এখন মুখে কুলুপ এঁটেছেন, না হয় ব্যস্ত আছি বলে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, টাটার কর্তারা বলছেন তাঁরা সিঙুরের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করবেন। এখনও পর্যন্ত এই হচ্ছে সিঙুরের মানুষের উন্নতির নমুনা। দখলিকৃত জমির আশেপাশের জমির চাষ বন্ধ। সিঙুরের আলু ধান শস্য চাষের ক্ষতি করে কোন উন্নয়ণ করবেন টাটারা? জামসেদপুরে এত বড় টাটা সাম্রাজ্য বিস্তার হলেও ঝাড়খন্ডের মানুষের এতটুকুও উন্নতি হয়নি কেন? পুঁজিপতি শিল্পপতিরা নিজেদের মুনাফা বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে ত্যাগ করেছে এমন ঘটনা কোনকালে ঘটেছে কি? যারা একদিন বড় গলা করে বলেছিল জমি দিলেই টাটার চাকরি, জমি হাতানোর নামে স্থানীয় ৭০০ যুবককে জমি পাহারার কাজে নিযুক্ত করেও আজ তারা কিছু টাকা নিয়ে চাকরির দাবি ছেড়ে দিতে বলছে কেন? এখন কেন রিষড়ায় তাদের কয়েকজনকে চোরের মতো ডেকে হুগলী জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুনীল সরকার বলছেন — কারখানায় চাকরি দেওয়া যাবে না, জমি হাতানোর আগে এসব কথা বলেননি কেন? আসলে টাটার টাকা খেয়ে টাটার দালালি করতে গিয়ে সুনীল সরকাররা ভাঁওতা দিয়ে জমি হাতিয়েছেন। আর পুঁজিপতির দালালি করতে গেলে চিটিংবাজির আশ্রয় নিতেই হয়। তাই নেতা থেকে ন্যাতা সবাই ভাঁওতা দিয়ে গেছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। এখনও বলা হচ্ছে কারখানা চালু হলে অনেক শ্রমিক লাগবে, তখন শ্রমিক সমবায় গড়ে তাঁদের কাজের ব্যবস্থা করা হবে। নেতাদের কথায় বিশ্বাস করে চাকরির লোভে যারা স্বেচ্ছায় টাটাকে জমি দিয়েছেন তাদের এরকম শিক্ষা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। মাতৃভূমি বিশ্বাসঘাতকদের ভালো শিক্ষাই দিয়েছে। যাদের জমি লুণ্ঠন করা হয়েছে, যারা অত্যাচারিত তাদের চোখের জল বৃথা যায়নি। কৃষকের অভিশাপে সিঙুরের মাটিতে টাটার ন্যানো লালবাতি জ্বলছে। ন্যানো সরাচ্ছে টাটারা। যাঁরা স্বেচ্ছায় জমি দেননি এবং টাকাও নেননি তাঁদের জমি ফেরত না দিলে অথবা তাঁদের রাজি করাতে না পারলে কোন দিনও টাটার ন্যানো সিঙুর থেকে বেরুবে না। হারামে জমি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা না পেলে শিল্প উৎপাদন কখনই সম্ভব নয়। আর জোর - পূর্বক জমি দখলকারীদের কেউ সাহায্য সহযোগিতা করে কি? এখন সিঙুর প্রশ্নে টাটা হুমকি দিচ্ছেন, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই ঠিক করতে হবে, তাঁরা রাজ্য শিল্পায়ন চান কি না।" কিন্তু সিঙুরে ফোকটে উন্নতমানের কৃষিজমি নেওয়ার পূর্বে কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মতামত নেওয়া হয়েছিল? সিঙুরে জমি দখলের সময় অসহায় কৃষকদের পুলিশ দিয়ে অত্যাচারের সময় কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মতামত নেওয়া হয়েছিল? অধিকৃত জমির মধ্যে লেঠেল দিয়ে তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে খুন করার সময় কি মতামত নেওয়া হয়েছিল? সিঙুরের মানুষ জমি ফেরত পাওয়ার প্রশ্নে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে। আর জমি দখল যখন শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়নি তখন জমি পুণর্দখল শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে কীভাবে। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, জমি দখলটাই বৈধ ভাবে হয়নি তাই তার প্রতিবাদটাও বৈধ ভাবে হবে কীভাবে। সুতরাং পুঁজিপতি বনাম অসহায় কৃষকের লড়াই আবারও আরম্ভ হতে চলেছে সিঙুরে।।

সিঙ্গুরে জমি ফেরতের দাবিতে আন্দোলন চলছে।

ফোরাম-এর সভায় ভাষণরত কমল ঘোষ দস্তিদার।

ন্যাশানালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরাম-এর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৬ জুলাই কলকাতায় কেশব ভবনে ন্যাশনালিস্ট ল ইয়ার্স ফোরাম-এর ২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী অমরেশ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী কালিদাস বসু ও বিশেষ অতিথি সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ভূপেন্দ্র যাদব। শ্রীযাদব রামসেতু মামলায় অধিবক্তাদের ভূমিকা-র কথা তুলে ধরেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৩ জন অধিবক্তা এবারের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ষষ্ঠ পে-কমিশন সংশোধনের দাবিতে বি এম এস-এর আন্দোলন

প্রিয়ব্রত দত্ত ।। গত ২৭ জুন ষষ্ঠ পে-কমিশনের ত্রুটি সংশোধন ও কার্যকরী করার দাবিতে বি এম এসের উদ্যোগে কলকাতায় মেট্রো রেলের সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। প্রায় দুশো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারি এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, গত ১০ই জুলাই দিল্লীতে এই একই দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দল নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় ২৫০ জন সরকারি কর্মচারী ওই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন।

এছাড়া এর তিনদিন আগে ২৩ জুলাই খিদিরপুর ডকে বি এম এস-এর ডাকে এক বিশাল সমাবেশ হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্য বি জে পি-র সভাপতি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (জলুবাবু), বি এম এস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক "শ্রীলক্ষ্মা রেড্ডী" প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উল্লেখ্য, গত ১৫ থেকে ২৩ জুলাই অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সারা রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ, ধর্ণা ও জেলাশাসকদের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পাটশিল্পে ব্যাপক শ্রমিক শোষণ, পি এফ-এর টাকা নয়ছয়, নূন্যতম মজুরি, বকেয়া ডি এ পে-স্কেল প্রথা চালু রাখা প্রভৃতির দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন বি এম এসের শুরু হয়েছে। জুলাই ও আগষ্ট মাস জুড়ে বিভিন্ন পাট কলে বিক্ষোভ, ধর্ণা, ডেপুটেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমস্যার সমাধান না হলে আগামী নভেম্বর মাসে পাটশিল্পে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে।

সমাবেশ ও সমাচার

রক্তদান শিবির

গত ২৩ জুলাই বি এম এস-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে মানিকতলার "নরেশ ভবনে' রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বি এম এস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মা রেড্ডী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। গত ২৫ জুলাই 'ইচ্ছাপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টারী'-তে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ২৫০ জনেরও বেশী রক্তদাতা রক্তদান করেন।

'মঙ্গল নিধি'

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মাদপুর খণ্ডের নিবড়া শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক শীতল চন্দ্র অট্ট তাঁর মধ্যম পুত্র অশোক কুমার অট্টের (হাওড়া জেলার সহ শারীরিক প্রমুখ) বিবাহ উপলক্ষে গত ২৮ জুন প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে সদর মহকুমা সঙ্ঘচালক গৌরহরি দত্তের হাতে সমাজ সেবা ভারতীর কাজের জন্য নগদ ১০০১ টাকা প্রদান করেন।

প্রকাশিত হচ্ছে ১৮ আগস্ট

স্বস্তিকা

১৫ আগস্ট সংখ্যা

স্বাধীনতার পর ষাট বছর পার হয়ে গেলেও জাতীয় সংহতির পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নেও দেশ আজ উদ্বিগ্ন। বিশেষত চীনের সামরিক তৎপরতায়। কেননা চীনের টার্গেট একটাই — ভারত। এই নিয়েই এবারে লিখেছেন — মেঃ জেঃ (অব) কে কে গাঙ্গুলি ও অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়।

এছাড়া অন্য বিভাগগুলি তো থাকছেই

দাম ৪ টাকা ।। সত্বর কপি বুক করুন

Swastika
11 August - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

ভোলে বাবা পার করেগা

বিশেষ প্রতিনিধি।। তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা। এই মেলা অঙ্কের নিয়মে শ্রাবণের পূর্ণিমা থেকে পুরো একমাস জোড়া অর্থাৎ পরের ভাদ্রপূর্ণিমা পর্যন্ত। মেলা কিন্তু আদপে বসে শ্রাবণের প্রথম সোমবার থেকে। সোমবার হল শিববার। তাই এই সময় শেওড়াফুলির জল গড়িয়ে যায় তারকেশ্বরের দুধপুকুরে। বম্ বম্ তারক বম্ ভোলে বম্ তারক বম্ ধ্বনিতে চলে বাবার মাথায় জল বর্ষণ। কিন্তু যিনি নিজ মস্তকে স্বয়ং গঙ্গাকে ধারণ করে বসে আছেন তাঁর মাথায় জল ঢালা কেন?

ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে এই লিঙ্গের কথা বলা হয়েছে। ১৭৭৯-৮১-তে ছাপা রেনেল সাহেবের বঙ্গদেশের মানচিত্রে তারকেশ্বরের হদিশ না থাকলেও ১৮৩০-৪৫ সময় কালে সরকার যে জরিপ কর্ম করেছিলেন তাতে তারকেশ্বরের উল্লেখ রয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে অযোধ্যার অন্তর্গত জৌনপুর এর ডোভী পরগণার হরিহরপুর গ্রামে রাজা বিষ্ণু দাস নামে এক ক্ষত্রিয় জমিদার ছিলেন। মুসলমান দস্যুদের অত্যাচারে তিনি শ'পাঁচেক অনুচর আর কনৌজ থেকে একশো বামুন সঙ্গে নিয়ে হুগলি জেলার হরিপালের কাছে রামনগর গ্রামে এসে বাস করতে আরম্ভ করলেন। বিষ্ণুদাসের অস্ত্রশস্ত্র আর লোকবল দেখে স্থানীয় মানুষেরা ভয় পেয়ে গেল। জনগণ সোজা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে গিয়ে নালিশ জানাল। নবাব বিষ্ণুদাসকে ডেকে পাঠালে তিনি তাঁর কাছে যাবতীয় বৃত্তান্ত পেশ করলেন। নবাবের সামনে তাঁর সত্যবাদিতা প্রমাণ করতে জলন্ত লোহার শাবল হাত দিয়ে খামচে ধরে পৌরুষত্বের অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করলেন। নবাব মহানন্দে তাঁকে বাস করার অনুমতি দিলেন। আর তারকেশ্বর হতে মাত্র চার ক্রোশ দূরে রামনগর গ্রামে বসবাস হেতু পাঁচশো বিঘে জমিও লিখেপড়ে দিলেন। এ সম্বন্ধে সরকারি বই List of Ancient Monuments in Bengal গ্রন্থে বিস্তারিত লেখা রয়েছে।

বিষ্ণুদাসের ছিল মস্ত গোশালা। আর এই গোশালার রক্ষক ছিল মুকুন্দরাম ঘোষ বলে এক ব্যক্তি। থাকতো গুড়েভাটা গ্রামে। একদিন মুকুন্দরাম প্রত্যক্ষ দেখল ওই নিবিড় জঙ্গলে কয়েকটি গাভী একখানি পাথরখণ্ডের ওপর নিজের বাঁট থেকে ঝর ঝরিয়ে দুধ বর্ষণ করছে। এ দৃশ্য দেখে মুকুন্দর চোখ ছানাবড়া। সে গিয়ে রাজা বিষ্ণুদাসের কাছে এই অলৌকিক ঘটনা বলল।

আড়ালে মুকুন্দ থাকি দরশন
পাথরের কাছে করে কপিলা গমন।।
বাঁট হাতে দুগ্ধধারা পাথর উপরে।
কপিলা ফেলিছে তাহা অনগলি ধারে।

বুঝিল মুকুন্দ ইহা পাথর ত নয়।
নিশ্চয় অনাদি লিঙ্গ শিব দয়াময়।।

বিষ্ণুদাস সব শুনে ইচ্ছে করলেন ওই শিলাটিকে খুঁড়ে তুলে এনে রামনগরে স্থাপন করবেন। সেই মতো কাজ শুরু হলো। কিন্তু পঞ্চাশ হাত মাটি খনন করেও তার গোড়া পাওয়া গেল না। রাতে ঘুমঘোরে রাজা স্বপ্ন দেখলেন বাবা তারকনাথ তাঁকে বললেন, শোনরে আকাট মুখ্যু, আমি সাক্ষাৎ তারকেশ্বর শিব। গয়া কাশী পর্যন্ত আমার পাথুরে শেকড় চালানো আছে। এখানেই আমার মন্দির বানিয়ে দাও। রাজা মন্দির বানিয়ে দিলেন আর দেব অর্চনার ভার দিলেন মুকুন্দরাম ঘোষের ওপর। এই মুকুন্দরামই তারকেশ্বরে প্রথম মোহান্ত। সেই মন্দিরটি ভগ্ন হলে বর্ধমানের

মহারাজা সেটি নতুন করে তৈরি করে দেন। সেই থেকেই গোটা বঙ্গদেশময় তারকেশ্বরের অলৌকিকতা প্রচারিত হল। দূর দূরান্ত থেকে যাত্রীদল এই তীর্থক্ষেত্রে আসতে লাগলেন। তারকেশ্বরের দুধ পুকুরে স্নান করে যা মনোবাঞ্ছা করা যায় তাই পূর্ণ হয়।

বর্তমানে যে মন্দিরটি দেখা যায় সেটি তৈরি করিয়ে দেন পাতুল সঙ্গিপুরের গোবর্দ্ধন রক্ষিত। বর্ধমান রাজার তৈরি করা দেওয়া মন্দিরটি আবার ছোট বলে রক্ষিত মশাই বর্তমান মন্দিরখানি গড়ে দেন। ১৮০১ সালে বালিগড়ির মহারাজ চিন্তামণি দে ব্যাধিগ্রস্তদের জন্য মন্দিরের সম্মুখে একটি নাটদালান গড়ে দেন।

তারকেশ্বর নিয়ে বঙ্গদেশে আড়োলন ওঠে ১৯৭৭ সালে। ঐ বছরে অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "বাবা তারকনাথ' ছবিটি মুক্তি পেয়ে গোটা রাজ্যে হুলুস্থুল ফেলে দেয়। 'বাঁকে কাঁধে চলরে, ভোলে বাবা বলরে' — এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিগ্রেডের জনসভার মতো শ্রাবণ মাসে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ তারকেশ্বরে যেতে আরম্ভ করলো। আজ তা একটা হুজুগে রূপান্তরিত হয়েছে। বহুপূর্বে তারকেশ্বরে যাতায়াতের ভারি অসুবিধে ছিল। ফলে ভক্তরা বৈদ্যবাটী থেকে হাঁটাপথে যেতেন। ১৮৮৫ সালে শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত

নতুন রেলপথ তৈরি হয় নীলকমল মিত্রের উদ্যোগে। আজকের ভক্তরা বৈদ্যবাটী 'নিমাই তীর্থের ঘাট' থেকে স্নান করে ভিজে বস্ত্রে হাঁটা দেয় তারকেশ্বরের পথে। পথ মোটামুটি ছাব্বিশ কিলোমিটার। যাত্রীরা দল বেঁধে রাতভর চলে। চাইলে পথিমধ্যে বিশ্রামার্ধ চটি আছে। নসীবপুর, ডাকাতিয়া কালীর মোড়, সিঙ্গুর, নালিকুল, হরিপাল, বহিরখণ্ড আর শেষ চটি লোকনাথ। নালিকুল আর হরিপালে 'কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতির' পান্থশালা আছে। এখানের বিশ্রামের সঙ্গে পানীয় জল আর জলখাবার মেলে বিনা পয়সায়। তবে তীর্থযাত্রীদের থেকে কর আদায় করে বৈদ্যবাটী পুরসভা ও তারকেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ। পাণ্ডাদের উৎপাতের থেকে এ উৎপাতও বড় কম নয়।

হিমালয়ের জাগেশ্বর শিবমন্দির

হিমালয় পর্বতমালার উপরে কুমায়ুনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোরম। ওই অঞ্চলে আলমোড়া শহর থেকে পূর্বোত্তর দিকে পিথোরাগড়ের পথে ৩৮ কিমি দূরে রয়েছে প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ জাগেশ্বর। দেবদারুর গাছে ঘেরা মন্দির। একটি দেবদারুর গাছের উচ্চতা ৬২.৮০ মিটার, গুঁড়ির ব্যাসও প্রায় ৮.১০ মিটার। পুরো অঞ্চল জুড়ে রয়েছে ১২৪টি মন্দির।

জাগেশ্বর মন্দির সমূহের প্রমুখ হল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির। কথিত আছে ওই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেছিলেন স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্য। পরে আদি শঙ্করাচার্য মন্দিরে বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনিই ভট্ট ব্রাহ্মণদের পূজারী নিযুক্ত করেছিলেন।

জাগেশ্বর মন্দিরের স্থাপত্যকলাও অতুলনীয়। পুরাতত্ত্ববিদদের মতে, জাগেশ্বর মন্দির কমপক্ষে ২৫০০ বছরের পুরনো। স্থানীয় লোককথা ও কিংবদন্তী অনুসারে জাগেশ্বর ধাম হিমালয় উপত্যকায় অনন্তকাল থেকেই রয়েছে। চন্দ্ররাজারা একসময়ে এই কুমায়ুন অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তাঁরা জাগেশ্বর ধামের জন্য অনেক গ্রাম দান করেছিলেন। মন্দিরের জন্য আর্থিক সহযোগিতাও তাঁরাই করেছিলেন।

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির জাগেশ্বরের সবক'টি মন্দিরের মধ্যে উচ্চতম। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র খোদাই করা আছে। দেওয়াল স্তম্ভে ২৫টি শিলালিপি আছে। ওই শিলালিপি পুরাতত্ত্ববিদদের মতে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেকার। এই শিলালিপিও মন্দিরের প্রাচীনত্বের এক অন্যতম নিদর্শন। কথিত আছে, ওখানের শিবলিঙ্গ দেখে আদি শঙ্করাচার্য প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁর সিদ্ধপীঠের অনুভূতি হয়েছিল।

হিমালয় পর্বতমালার জাগেশ্বর ধাম আধ্যাত্মিক শক্তি, শান্তি এবং আকর্ষণের কেন্দ্র।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com